ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ ১৩১৯

•••

পুনর্মুদ্রণ ১৩৩৫ ভাদ্র, ১৩৪৫ আষাঢ়, ১৩৫৫ আশ্বিন

১৩৬২ কার্তিক

ছিন্নপত্র ০ ০ ০

১

বন্দোরা সমুদ্রতীর

৩০ অক্টোবর ১৮৮৫

ভারি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগতই বৃষ্টি। এখনো বিরামের লক্ষণ নেই। আমার বারান্দার কাঁচের জানালা সমস্ত বন্ধ ক'রে চুপ মেরে বসে আছি। নিতান্ত মন্দ লাগছে না, আপনাতে আপনি বেশ একরকম আচ্ছন্ন হয়ে আছি— কোনোপ্রকার emotionএর প্রাবল্য নেই— ঝড়-ঝঞ্ঝা যা-কিছু সমস্তই বাহিরে। অসহায় অনাবৃত সমুদ্র ফুলে ফুলে ফেনিয়ে ফেনিয়ে সাদা হয়ে উঠছে। সমুদ্রকে দেখে আমার মনে হয় কী একটা প্রকাণ্ড অন্ধ শক্তি বাঁধা প'ড়ে আস্ফালন করছে— আমরা নিশ্চিন্তমনে তীরে দাঁড়িয়ে আছি— সমুদ্রের বিস্ফারিত গ্রাসের মুখেই আমরা ঘরবাড়ি বেঁধে বসে আছি। আমরা যেন সিংহের কেশর ধরে টানছি, অথচ অসহায় সিংহ কিছু বলতে পারছে না— একবার যদি সমস্ত সমুদ্র ছাড়া পায় তা হলে আমাদের আর চিহ্নমাত্র থাকে না। খাঁচার মধ্যে বাঘ তার লেজ আছড়াচ্ছে, আমরা কেবল দু হাত তফাতে দাঁড়িয়ে হাসছি। একবার চেয়ে দেখুন কী বিপুল বল। তরঙ্গগুলো যেন দৈত্যের মাংসপেশীর মতো ফুলে উঠছে। পৃথিবীর সৃষ্টির আরম্ভ থেকে এই ডাঙায় জলে লড়াই চলছে— ডাঙা ধীরে ধীরে নীরবে এক-এক পা ক'রে আপনার অধিকার বিস্তার করছে, আপনার সন্তানদের ক্রমেই কোল বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে— আর পরাজিত সমুদ্র পিছু হটে হটে কেবল ফুঁসে ফুঁসে বক্ষে করাঘাত করে মরছে। মনে রাখবেন এক কালে সমুদ্রের একাধিপত্য ছিল— তখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভূমি তারই গর্ভ থেকে উঠে তার সিংহাসন কেড়ে নিয়েছে, উন্মাদ বৃদ্ধ সমুদ্র তার শুভ্র ফেনা নিয়ে King Lear'এর মতো ঝড়ে ঝঞ্ঝায় অনাবৃত আকাশে কেবল বিলাপ করছে।

২

সোলাপুর

অক্টোবর ১৮৮৫

আপনি তো সব-ডেপুটি সাহেব— বন্যার মুখে বাংলা মুল্লুকে ভেসে বেড়াচ্ছেন— আমরা কলকাতায় যাচ্ছি সে খবর রাখেন কি? এই চিঠি এবং আমরা শুক্রবারের সকালের ডাকে কলিকাতায় বিলি হব। আমাদের প্রবাসের পালা সাঙ্গ করলুম— এখানকার অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি, এসব পশ্চাতে রেখে সেই বাঁশতলার গলি, জোড়াসাঁকোর মোড়, সেই ছেক্ড়া গাড়ির আস্তাবল, সেই ধুলো, সেই ঘড়্‌ঘড়্‌ হুড়্‌মুড়্‌ হৈহৈ, সেই মাছি-ভন্‌-ভন্‌ ময়রার দোকান, সেই ঘোরতর হিজিবিজি হ-য-ব-র-ল'র মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করতে চললুম। সেখানে তিন হাজার গির্জের চুড়ো, কলের চিমনি, জাহাজের মাস্তুল নীল আকাশে যেন গুঁতো মারতে উঠেছে, কলকাতা তার সমস্ত লোষ্ট্রকাষ্ঠ দিয়ে প্রকৃতিকে গঙ্গা পার করেছে— তার উপরে আবার এক পাঁচিল-দেওয়া নিমতলার ঘাট, মানুষের মরেও সুখ নেই। এখানে আমরা ক'জনে মিলে অশোককাননের নীড়ের মধ্যে ছিলুম, সেখানে একপ্রকার ইঁটের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করতে চললুম। সেখানকার সেই লক্ষ লক্ষ কয়েদির সঙ্গে municipality'র দুর্গের মধ্যে বন্দী হতে চললুম। শুনে সুখী হলেন তো?

এতদিন ভুলে ছিলেম, কিন্তু আজ আবার আমার সেই পর্দা-টানা ঘোমটা-দেওয়া ঘরটি মনে পড়ছে। কিন্তু কোথায় আপনি, কোথায় আপনার সেই ছাতা, পাপোষ-শয্যায় শয়ান সেই পুরাতন জুতোযুগল! আমার সেই হৃষ্টপুষ্ট বিরহিণী তাকিয়া— সে কি আমাদের বিরহে রোগা হয়ে গেছে, আমি তাই ভাবছি। আমার

বইগুলো কাঁচের অন্তঃপুর থেকে চেয়ে আছে— কিন্তু কার দিকে চেয়ে আছে ? আমার শূন্যহৃদয়া চৌকি দিনরাত্রি তার দুই বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এখন তার এই নীরব আহ্বান কেউ গ্রাহ্য করে না। আমার সেই ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে, সে বড়ো একটা কাউকে খাতির করে না, সে কেবল সময়ের পদচিহ্নের হিসেব রাখতেই ব্যস্ত। কিন্তু আমার সেই হার্মোনিয়ম ! সে আপনার নীরব সংগীতের উপর বনাত মুড়ি দিয়ে ভাবছে, ঘড়িটা ব্রাকেটের উপরে দাঁড়িয়ে মিছেমিছি তাল দিয়ে মরছে কেন ? দেয়ালগুলো তাকিয়ে আছে— ভাবছে, ঘরের প্রধান আসবাবটা গেল কোথায় ? কলকাতার সেই জনতাসমুদ্রের মধ্যে আমার সেই বিরহান্ধকার ঘরটিই কেবল বিজন। তার সেই রুদ্ধ দ্বারের ভিতর থেকে কাতর স্বর উঠছে, রবি বাবু—উ—উ—উ। রবিবাবু আজ এখান থেকে সাড়া দিচ্ছেন, এই যা—আ—আ—ই।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে কি আর আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে না ? আপনি কি এখন ইহজন্মের মতো সব-ডেপুটিপুরে প্রয়াণ করলেন ? শীঘ্র আর মুক্তির ভরসা নেই ? আইনের গলগ্রহ গলায় বেঁধে আপনি কি তা হলে সর্বিস-সরোবরে একরকম ডুব মারলেন ? যাক, তা হলে আপনার আশা একেবারে পরিত্যাগ ক'রে আমরা আশমানে বিহার করি আর বলাবলি করি, 'আহা, শ্রীশবাবু লোকটা ছিলেন ভালো।'

৩

১৭ এপ্রেল ১৮৮৬

সাব-ডেপুটি সা'ব,

৺গয়াধামে আপনি গমন করেছেন, এখন আমার কী গতি করে গেলেন? আপনার দর্শন আমার নিয়মিত বরাদ্দের মতো হয়ে গিয়েছিল, এখন তার থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি মৌতাতহীন অহিফেন-সেবীর মতো ছট্‌ফট্‌ করছি। বাস্তবিক আপনি আমাকে অহিফেনই ধরিয়েছেন বটে। আপনি এসে নানা কৌশলে আমাকে গোটাকতক ছোটো ছোটো কল্পনার গুলি গেলাতেন, আমার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতেন, আমাকে আমারই প্রভাতসংগীত-সন্ধ্যাসংগীতের মধ্যে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতেন, আমি চোখ বুজে আনন্দে আমার নিজের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বসে থাকতুম এবং সেইখান থেকে নেশার ঝোঁকে স্বগত উক্তি প্রয়োগ করতুম, আপনি শুনে মনে মনে হাসতেন। আফিমের নেশা একেই বলে। আত্মম্ভরিতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে নিজের স্বপ্নে ভোর হওয়াকেই বলে আফিমের নেশা। আপনি সেই নেশাটাই আমাকে অভ্যেস করিয়েছেন। আপনি প্রায় আপনার নিজের কথা বলতেন না, উল্‌টে পাল্‌টে আমারই কবিতা, আমারই লেখা, আমারই কথার মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে ফেলতেন— আমাকে খুব মাতিয়ে রেখেছিলেন যাহোক! ইংরেজেরা বর্মায় চীনে আফিম ঢুকিয়েছে, আপনি আমার সেই অয়েল্‌ক্লথ-মণ্ডিত ক্ষুদ্র ঘরটির মধ্যে গোপনে অলক্ষ্যে আফিমের ব্যাবসা প্রবেশ করিয়েছেন— আপনি সহজ লোকটি নন। কিন্তু একবার আফিম ধরিয়ে আপনি কৌটা-সমেত কোথায় অন্তর্ধান হলেন? আমি মৌতাত-বিরহে এই দুরন্ত গ্রীষ্মে একলা ঘরে ব'সে দু বেলা হাই তুলছি এবং গা-মোড়া দিচ্ছি। নিদেন, আমার দ্বারের পার্শ্বে আপনার সেই পরিচিত ছাতিটা জুতোটা রেখে গেলেও আমার

কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা ছিল। আপনার পত্রপাঠে অবগত হলেম আপনি শ্রীগয়াধামে আপনার প্রেতপুরীতে মনুষ্যাভাবে নিতান্ত কাতর আছেন, কিন্তু আপনার কাজ আপনার সঙ্গী, অর্থাৎ আপনি আছেন এবং আপনার চিরসঙ্গী 'সাব-ডেপুটি' আপনার ছায়ার মতো সঙ্গে আছেন। সে সঙ্গীকে এখনো আপনার তেমন ভালো লাগছে না, কিন্তু ক্রমে তার প্রতি প্রীতি জন্মানো কিছু অসম্ভব নয়।

আমি-ব্যক্তির হাতে এখন কোনো কাজকর্ম নেই— চাপকানের বোতামগুলো খুলে দেহ এলিয়ে এখন গায়ে বাতাস লাগাচ্ছি, সৌভাগ্যক্রমে এখন অহিফেনের ততটা দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তাকিয়ার মধ্যে স্বপ্ন পোষা রয়েছে— সেটা একটা স্বপ্নের বৃহৎ ডিবের মতো বোধ হচ্ছে, তার উপরে মাথা রাখলেই মাথার মধ্যে হুহু ক'রে নেশা প্রবেশ করে। এতদিন মাথার উপরে 'বালক' কাগজের বোঝাটা থাকাতেই মাথা যেন রুদ্ধ হয়ে ছিল, নেশা একেবারে ছুটে গিয়েছিল— এখন সমস্ত খোলাসা— দক্ষিনে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা যেন চার দিকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

এ সময়ে আমাকে যদি একটা বাগান দিতে পারতেন। নদীর তীর, গাছের ছায়া, মাঠের বাতাস, আমের বোল, কোকিলের কুহু, বসন্তী রঙের চাদর, বকুল ফুলের মালা, এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও চাচ্ছি। কলকাতা শহর, পোলিটিকেল এজিটেশন, বসন্তকালে এ তো সহ্য হয় না। কোথায় আপনার বাগান শ্রীশবাবু, কোথায় আপনি ? সংস্কৃত কবি বলেছেন—

সংগমবিরহবিকল্পে বরমপি বিরহো ন সংগমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

ভাবার্থ : সংগম এবং বিরহের মধ্যে বরং বিরহ ভালো, তবু সংগম কিছু না— কারণ, মিলনের অবস্থায় সে একা আমার কাছে থাকে

মাত্র, আর [illegible] ত্রিভুবন তাতেই পূরে যায়। কিন্তু ভট্‌চার্য মশায়ের সঙ্গে আমার মতের মিল হল না—আপনার হিরহে আমার এইরকম মনে হচ্ছে যে, ত্রিভুবনময় শ্রীশবাবুর ঝাঁক থাকার চেয়ে হাতের কাছে একটা শ্রীশবাবু থাকা ভালো। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, ঝোপের মধ্যে গণ্ডাখানেক পাখি থাকার চেয়ে মুঠোর মধ্যে একটা পাখি থাকা ঢের ভালো। এ সম্বন্ধে আমি এই ইংরেজের মতো practical view নিয়ে থাকি। আপনি কী বলেন আমি জানতে ইচ্ছে করি।

৩০ এপ্রেল ১৮৮৬

ইতিমধ্যে একদিন গো—বাবুদের ওখানে যাওয়া গিয়েছিল। সেখানে আমি আপনার 'বাঙ্গালার বসন্তোৎসব'এর কথা পাড়লুম, আশ্চর্য হলুম,তাঁরাও সকলে একবাক্যে আপনার এই লেখার প্রশংসা করলেন। আশ্চর্য হবার কারণ এই যে, ভালো লাগা এক, এবং ভালো বলা এক। ভালো জিনিস সহজেই ভালো লাগে, তর্কবিতর্ক যুক্তিবিচার ক'রে ভালো লাগে না— কিন্তু সমালোচনা করবার সময়ে মনের মধ্যে এমনি তর্কবিচারের প্রাদুর্ভাব হয় যে, খপ্ ক'রে একটা জিনিসকে ভালো বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, যে লেখাটা পড়লুম সেটা লিখছে কে, তাতে আছে কী, তাতে নূতন কথা বলা হয়েছে কি, এইরকম লেখাকে সমালোচকেরা কী ব'লে থাকে, এ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং তার পরে দেখতে দেখতে দলে দলে 'যদি' 'কিন্তু' 'কী জানি' 'হয়তো' প্রভৃতি সহস্র রক্তশোষকের আমদানি হয়। তাঁরা চতুর্দিকে তিন ক্রোশের মধ্যে রসকষ কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। 'ভালো লাগা' জিনিসটি এমনি কোমল সুকুমার যে,ভালো লেগেছে কি না এই সহজ সত্যটুকু ঘটা ক'রে প্রমাণ করতে বসলে সে ব্যক্তি যায়-যায় হয়ে ওঠে। সমালোচকেরা আপনার বিরুদ্ধে আপনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, ভালো লাগলেও তারা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ ক'রে দেয় যে ভালো লাগে নি। এই গেল সমালোচনতত্ত্ব। যা হোক, আপনার বহিটা শেষ হয়ে গেলে সাধারণ পাঠকদের কিরকম লাগে জানতে ইচ্ছে রইল। হয়তো বা ভালো লাগতেও পারে। ভালো লাগবার একটা কারণ এই দেখছি, আপনি আপনার কেতাবের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশের একটি সজীব মূর্তি জাগ্রত ক'রে তুলেছেন,

বাংলার আর কোনো লেখক এতে কৃতকার্য হন নি। এখনকার অধিকাংশ বাংলা বই প'ড়ে আমার এই মনে হয় যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সময় বাংলাদেশই ছিল কি না ভবিষ্যতে এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন কোনো মার্কিন-দেশীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলেন, পাণিনি যে ভাষার ব্যাকরণ সে ভাষাই কোনো কালে ছিল না— তিনি দেখেছেন পাণিনিতে এমন অনেক ধাতু প্রভৃতি পাওয়া যায় সমস্ত সংস্কৃত ভাষায় যা খুঁজলে মেলে না। এই-রূপ নানা কারণে তিনি ঠিক ক'রে রেখেছেন যে, পাণিনি-ব্যাকরণটি এমন একটি ঘোড়ার ডিম যা কোনো ঘোড়ায় পাড়ে নি। অনেক ভাষা আছে যার ব্যাকরণ এখনো তৈরি হয় নি, কিন্তু কে জানত এমন ব্যাকরণ আছে যার ভাষা তৈরি হয় নি! এই ঘটনায় আমার মনে হয়েছে, ভবিষ্যতে এমন একজন তত্ত্বজ্ঞের প্রাদুর্ভাব হতে পারে যিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ ক'রে দিতে পারবেন যে, বাংলা সাহিত্য যে দেশের সাহিত্য সে দেশ মূলেই ছিল না— তখন বঙ্কিমবাবুর এত সাধের 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং' পুরাতত্ত্বের গবেষণার তোড়ে কোথায় ভেসে যাবে। পণ্ডিতেরা বলবেন, বঙ্গসাহিত্য একটা কলেজের সাহিত্য, এটা দশের সাহিত্য নয়—কিন্তু সে কলেজটা ছিল কোথায় এ বিষয়ে কিছুই মীমাংসা হবে না। আপনার সেই লেখাটির মধ্যে বাংলাদেশের সন্ধান পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের পূর্ববিভাগের জিয়োগ্রাফির প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। আপনার সেই লেখার মধ্যে অধিকাংশ স্থলে বাংলার ছেলেমেয়েরা কালেজি কথা কয় না ও কালেজি কাজ করে না, তারা প্রতিদিন গৃহের মধ্যে যেরকম কথা কয় ও যেরকম কাজ করে তাই দেখতে পাওয়া যায়। অন্য কারও অথবা ক্ষুদ্র আমার লেখায় সেইটি হবার জো নেই। কিন্তু আপনাকে আর অহংকৃত করা হবে না, অতএব এখানেই সমালোচনায় ক্ষান্ত হলুম।

৫

১৮৮৮

আপনার চিঠি এইমাত্র পেলুম, বেলা দশটা বেজে গেছে। বাহিরে অসহ্য উত্তাপ, আমাদের ঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ— অন্ধকার— মাথার উপরে পাখা আনাগোনা করছে; আর্দ্র খস্‌খস্‌ ভেদ ক'রে প্রচণ্ড পশ্চিমপবন শীতল ভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে। ঘরের মধ্যে একরকম আছি ভালো। সেই পুরাতন ডেস্কের উপর ঝুঁকে প'ড়ে চিঠি লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি।— আপনার 'ফুলজানি' আমি পূর্বেই ভারতীতে পড়েছি এবং পড়েই আপনাকে একটা চিঠি লিখব মনে করেছিলুম। তার পরে ভাবলুম, আপনি একেই তো চিঠির উত্তর বহু বিলম্বে দেন, তার পর যদি বিনা উত্তরেই চিঠি লিখি তবে আপনাকে অত্যন্ত আশ্‌কারা দেওয়া হয়। এরকম ব্যবহার পেলে বন্ধুদের স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। তাই নিবৃত্ত হলুম। আপনার লেখা আমার ভারি ভালো লাগে। ওর মধ্যে কোনোরকম নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই। আর এমন একটি ছবি মনে এনে দেয় যা আমাদের দেশের কোনো লেখকের লেখাতে দেয় না। আপনি কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না— সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন। শীতল ছায়া, আম-কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা,এরই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে,তরল কলধ্বনি তুলে, বিরহমিলন হাসিকান্না নিয়ে যে মানবজীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন। প্রকৃতির শান্তির মধ্যে, স্নিগ্ধচ্ছায়া শ্যামল নীড়ের মধ্যে যেসব ছোটো ছোটো হৃদয়ের

ব্যাকুলতা বাস করছে, দোয়েল কোকিল বউকথাকও'এর গানের সঙ্গে মানবহৃদয়ের যে-সকল আকাঙ্ক্ষাধ্বনি মিশ্রিত হয়ে অবিশ্রাম আকাশের দিকে উঠছে, আপনার লেখার মধ্যে সেই ছবি এবং সেই গান মেশাবেন। কোনোরকম জটিলতা বা চরিত্রবিশ্লেষণ বা দুর্দান্ত অসাধারণ হৃদয়াবেগ এনে স্বচ্ছ মধুর শান্তিময় ঘটনাস্রোতকে ঘোলা করে তুলবেন না। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি অধিক ফলাও কাণ্ড না করেন তা হলে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখকের সঙ্গে সমান আসন পেতে পারবেন। বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালিদের সুখদুঃখের কথা এপর্যন্ত কেহই বলেন নি— আপনার উপর সেই ভার রইল। বঙ্কিমবাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালির কথা যেখানে বলেছেন সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালির কথা বলতে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে ; চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড়ো বড়ো মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল-দেশীয় সকল-জাতীয় লোকই হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতি এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালি আঁকতে পারেন নি। আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ডকর্মশীল-পৃথিবীর-এক-নিভৃতপ্রান্ত-বাসী শান্ত বাঙালির কাহিনী কেউ ভালো করে বলে নি।

১৮৮৭

মাভৈঃ মাভৈঃ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আসবে কিন্তু 'সপ্তাহ' [১] আর বের হবে না। অতএব বন্ধুবান্ধবেরা সকলে নিশ্চিন্ত হউন। ভেবে দেখুন কী করতে বসেছিলুম। সপ্তাহ বের করবার ছল করে জীবন থেকে সপ্তাহগুলো একেবারে লোপ করতে বসেছিলুম। এখন যেমন আমি সপ্তাহে সাতটা দিন করে পাই তখন সপ্তাহে সাতটা দিন বাদ পড়ত। মাসের পর মাস আসত, কিন্তু সপ্তাহ নেই; দিনগুলো আমাকে লাঠি হাতে তাড়া করে বেড়াত। আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ভেবে পেতুম না। হরিশ্চন্দ্র যেমন বিশ্বামিত্রকে সমস্ত পৃথিবী দান করে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, অবশেষে স্বর্গটা পর্যন্ত অদৃষ্টে জুটল না, আমিও তেমনি আমার সমস্ত সময় পরের হাতে দিয়ে অবশেষে স্বর্গ পর্যন্ত খোওয়াতুম— কারণ, খবরের কাগজ লিখে এপর্যন্ত কেউ অমরলোক প্রাপ্ত হয় নি। এই বসন্তকাল এসেছে, দক্ষিণের হাওয়া বয়েছে, এ সময়টা একটু-আধটু গান-বাজনার সময়— এ সময়টা যদি কেবলই রুশ, চীন, পাঠানের অরাজকত্ব, মগের মুল্লুক, আব্‌কারি ডিপার্ট্‌মেণ্ট্‌, লুনের মাশুল, তারের খবর এবং পৃথিবীর যত শয়তানের প্রতি নজর রাখতে হয় তা হলে তো আর বাঁচি নে। পৃথিবীর গুপ্তচর হয়ে বেঁচে কোনো সুখ নেই। জীবনে তো বসন্তকাল বেশি আসে না। যতদিন যৌবন ততদিন গোটাকতক বসন্ত হাতে পাওয়া যায়— সে ক'টা না খুইয়ে মনে করছি বুড়োবয়সে একটা খবরের কাগজ খুলব; তখন হয়তো প্রাণ খোলা নেই, গান বন্ধ, সেই

১ 'সপ্তাহ'-নামক সাপ্তাহিক পত্র বাহির করার আয়োজন উপলক্ষে লিখিত।

সময়টা ভাঙা গলায় পলিটিক্‌স্ প্রচার করা যাবে। এখনো অনেক কথা বলা বাকি আছে, সেগুলো হয়ে যাক আগে। কী বলেন ?— আপনার চিঠিতে রানী শরৎসুন্দরীর বিবরণ পড়ে আমার বড়ো ভালো লাগল। আপনি তাঁর স্নেহ ভোগ করেছেন এ আপনার নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। তাঁর জীবন-সম্বন্ধে কিছু লিখলে ভালো হয়। আমাদের মহদ্দৃষ্টান্ত নানা কারণে আমাদের নজরে পড়ে না, সেগুলো যাতে আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে সে চেষ্টা করা উচিত।

৭

অক্টোবর ১৮৮৭

আমি প্রায় এক মাস কাল দার্জিলিঙে কাটিয়ে এলুম। আপনার পত্র কলকাতায় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমি ফিরে এসে পেলুম। আপনাকে অনেক দিন থেকে লিখি-লিখি করছি, কিন্তু দৈব-বিপাকে হয়ে ওঠে নি। এবার আমার ততটা দোষ ছিল না। আমার কোমরে বাত হয়ে কিছুকাল শয্যাগত হয়ে পড়েছিলুম, এখনো ভালো করে সারি নি। তবে এখন বিছানা থেকে উঠে বসেছি। কিন্তু বেশিক্ষণ চৌকিতে বসে থাকতে পারি নে। আমার কোমর ছাড়া পৃথিবীতে আর আর সমস্ত মঙ্গল। আমার স্ত্রী কন্যা দার্জিলিঙে, আমি কলকাতায় ঘরে ব'সে বিরহ ভোগ করছি— কিন্তু বিরহের চেয়ে কোমরের বাতটা বেশি গুরুতর বোধ হচ্ছে। কবিরা যাই বলুন, আমি এবার টের পেয়েছি বাতের কাছে বিরহ লাগে না। কোমরে বাত হলে চন্দনপঙ্ক লেপন করলে দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে, চন্দ্রমাশালিনী পূর্ণিমাযামিনী সান্ত্বনার কারণ না হয়ে যন্ত্রণার কারণ হয়, আর স্নিগ্ধ সমীরণকে বিভীষিকা ব'লে জ্ঞান হয়— অথচ কালিদাস থেকে রাজকৃষ্ণ রায় পর্যন্ত কেউই বাতের উপর এক ছত্র কবিতা লেখেন নি, বোধ হয় কারও বাত হয় নি। আমি লিখব। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাকে একটা তত্ত্বের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করি— বিরহের কষ্টই বা কেন কবিতার বিষয় আর বাতের কষ্টই বা কেন কবিতার বিষয় নয়? কোমরটাকে যত সামান্য বোধ হত এখন তো তত সামান্য বোধ হয় না। হৃদয় ভেঙে গেলেও মানুষ মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে— কিন্তু কোমর ভেঙে গেলেই মানুষ একেবারে কাৎ, তার আর উত্থানশক্তি থাকে না। তখন প্রেমের আহ্বান, স্বদেশের আহ্বান, সমস্ত পৃথিবীর আহ্বান এলেও সে কোমরে টার্পিন তেল

মালিশ করবে। যতদিন মানুষের কোমর না ভাঙে ততদিন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি মানুষ ঠিক অনুভব করতে পারে না— আপনি কেতাবে পড়েছেন কিন্তু তবুও জানেন না যে, জননী বসুন্ধরা ক্রমাগতই আমাদের মধ্যদেশ ধ'রে আকর্ষণ করছেন, বাত হলেই তবে তাঁর সেই মাতৃস্নেহের প্রবল টান সবিশেষ অনুভব করা যায়। যা হোক শ্রীশবাবু, বন্ধুর দুর্দশা অবধান ক'রে কোমরকে আর কখনো হেয়জ্ঞান করবেন না— কপাল ভাঙা সে তো রূপক মাত্র, কিন্তু কোমর ভাঙা অত্যন্ত সত্য, তাতে কল্পনার লেশমাত্র নেই। সেই সত্য, বর্তমান কালে অত্যন্ত অনুভব করছি ব'লে আপনাকে আর চিঠি লিখতে পারছি নে। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আপনি প্রশ্ন করেছেন সে বিষয় পরে উত্থাপন করা যাবে ; আপাতত এই ব'লে রাখছি, বাল্যবিবাহ যে ইচ্ছে করুক, কিন্তু কোমরে বাত যেন কারও না হয়।

৮

২৭ জুলাই ১৮৮৭

বহুদিন চিঠিপত্র লিখি নি, কারণ চিঠি লেখা কম কাণ্ড নয়। দিনের পর দিন চ'লে যাচ্ছে, কেবল বয়স বাড়ছে। দু বৎসর আগে পঁচিশ ছিলুম, এইবার সাতাশে পড়েছি— এই ঘটনাটাই কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়ছে, আর কোনো ঘটনা তো দেখছি নে। কিন্তু সাতাশ হওয়াই কি কম কথা! কুড়ির কোঠার মধ্যাহ্ন পেরিয়ে ত্রিশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। ত্রিশ, অর্থাৎ ঝুনো অবস্থা। অর্থাৎ যে অবস্থায় লোকে সহজেই রসের অপেক্ষা শস্যের প্রত্যাশা করে— কিন্তু শস্যের সম্ভাবনা কই? এখনো মাথা নাড়া দিলে মাথার মধ্যে রস থল্ থল্ করে— কই, তত্ত্বজ্ঞান কই? লোকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছে, 'তোমার কাছে যা আশা করছি তা কই? এতদিন আশায় আশায় ছিলুম, তাই কচি অবস্থার শ্যাম শোভা দেখেও সন্তোষ জন্মাত, কিন্তু তাই ব'লে চিরদিন কচি থাকলে তো চলবে না। এবারে তোমার কাছে কতখানি লাভ করতে পারব তাই জানতে চাই— চোখে-ঠুলি-বাঁধা নিরপেক্ষ সমালোচকের ঘানি-সংযোগে তোমার কাছ থেকে কতটুকু তেল আদায় হতে পারে এবার তার একটা হিসেব চাই।' আর তো ফাঁকি দিয়ে চলে না। এতদিন বয়স অল্প ছিল, ভবিষ্যতে সাবালক অবস্থার ভরসায় লোকে ধারে খ্যাতি দিত। এখন ত্রিশ বৎসর হতে চলল, আর তো তাদের বসিয়ে রাখলে চলে না। কিন্তু পাকা কথা কিছুতেই বেরোয় না শ্রীশবাবু! যাতে পাঁচ জনের কিছু লভ্য হয় এমন বন্দোবস্ত করতে পারছি নে। দুটো গান বা গুজব, হাসি বা তামাশা, এর চেয়ে বেশি আর কিছু হয়ে উঠল না। যারা প্রত্যাশা করেছিল তারা মাঝের থেকে আমারই উপর চটবে। কিন্তু কে তাদের মাথার দিব্যি দিয়ে

প্রত্যাশা করতে বলেছিল? হঠাৎ একদিন বৈশাখের প্রভাতে নব-বর্ষের নূতন পত্র পুষ্প আলোক ও সমীরণের মধ্যে জেগে উঠে যখন শুনলুম আমার বয়স সাতাশ তখন আমার মনে এই-সকল কথার উদয় হল। আসল কথা— যতদিন আপনি কোনো লোককে বা বস্তুকে সম্পূর্ণ না জানেন ততদিন কল্পনা ও কৌতূহল মিশিয়ে তার প্রতি একপ্রকার বিশেষ আসক্তি থাকে। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত কোনো লোককে সম্পূর্ণ জানা যায় না— তার যে কী হবে, কী হতে পারে কিছুই বলা যায় না; তার যতটুকু সম্ভূত তার চেয়ে সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু সাতাশ বৎসরে মানুষকে একরকম ঠাহর করা যায়— বোঝা যায় তার যা হবার তা একরকম হয়েছে, এখন থেকে প্রায় এই রকমই বরাবরই চলবে, এ লোকের জীবনে হঠাৎ আশ্চর্য হবার আর কোনো কারণ রইল না। এই সময়ে তার চার দিক থেকে কতকগুলো লোক ঝরে যায়, কতকগুলো লোক স্থায়ী হয়— এই সময়ে যারা রইল তারাই রইল। কিন্তু আর নূতন প্রেমের আশাও রইল না, নূতন বিরহের আশঙ্কাও গেল। অতএব এ একরকম মন্দ নয়। জীবনের আরামজনক স্থায়িত্ব লাভ করা গেল। আপনাকেও বোঝা গেল এবং অন্যদেরও বোঝা গেল। ভাবনা গেল।

আজকাল আমাদের এখানে বর্ষা পড়েছে। ঘন মেঘ ও অবিরাম বৃষ্টি। এই সময়ই তো বন্ধুসংগমের সময়। এই সময়টা ইচ্ছে করছে, তাকিয়া আশ্রয় ক'রে প'ড়ে প'ড়ে যা-তা বকাবকি করি। বাইরে কেবল ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি, ঝন্ ঝন্ বজ্র, হু হু বাতাস এবং রাজপথে সেকড়াগাড়ির জীর্ণ চক্রের কদাচিৎ খড়্ খড়্ শব্দ। ইংরাজ-রাজের উপদ্রবে তাও ভালো করে হবার জো নেই — ইংরাজ-রাজত্বে বজ্র বৃষ্টি বাতাস এবং সেকড়া গাড়ির অভাব নেই, কিন্তু এই রাক্ষসী তার দেশ-বিদেশ-ব্যাপী আফিস আদালত

প্রভৃতি বদন ব্যাদান-পূর্বক তাকিয়ার কোমল কোল শূন্য ক'রে আমাদের গোটা গোটা বন্ধুবান্ধবদের গ্রাস ক'রে ফেলছে ; এই ভরা বাদরে আমাদের মন্দির হাহাকার করছে। 'আষাঢ়ে গল্প' -নামক আমাদের একটি নিতান্ত দেশজ পদার্থ অন্যান্য সহস্র দেশজ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবার উপক্রম করছে। আমাদের সেই বহুপুরাতন আষাঢ় সহস্র দালান ও চণ্ডীমণ্ডপের চক্ষের সম্মুখে অবিশ্রাম কেঁদে মরছে, কিন্তু তার আষাঢ়ে গল্প নেই। আমাদের সেই শত শত গান গল্প সাহিত্যচর্চার স্মৃতিতে ও তুলোতে পরিপূর্ণ তাকিয়াই বা কোথায়, আমিই্ বা কোথায়, এবং আপনিই বা কোথায়! যত্নপতিই বা কোথায়, মথুরাপুরীই বা কোথায়! অতএব, হে বন্ধুবর—

ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।

এই আমার চিঠির moral, তত্ত্ব, উদ্দেশ্য— অতএব কেবল এইটুকু গ্রহণ ক'রে বাকিটুকু বাদ দেবেন, কিন্তু চট্‌পট্ উত্তর দিতে ভুলবেন না।

আপনার বিশেষরূপে মনে থাকবে ব'লে এই চিঠির কিয়দংশ পদ্যে অনুবাদ ক'রে পাঠাই, অবধান করা হউক।—

বন্ধু হে,

পরিপূর্ণ বরষায়
আছি তব ভরসায়
কাজকর্ম করো সায়—
এসো চট্‌পট্।
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য
তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা প'ড়ে মোর চিত্ত
করে ছট্‌ফট্।

যখন যা সাজে ভাই
তখন করিবে তাই ;
কালাকাল মানা নাই
কলির বিচার—

শ্রাবণে ডেপুটি-পনা
এ তো কভু নয় সনা-
তন প্রথা এ যে অনা-
সৃষ্টি অনাচার।

রাজছত্র ফেলো শ্যাম,
এসো এই ব্রজধাম,
কলিকাতা যার নাম
কিংবা ক্যাল্‌কাটা।

ঘুরেছিলে এইখেনে
কত রোডে কত লেনে,
এইখেনে ফেলো এনে
জুতোসুদ্ধ পা'টা।

ছুটি লয়ে কোনোমতে
পোটমাণ্টো তুলি রথে
সেজেগুজে রেলপথে
করো অভিসার।

লয়ে দাড়ি লয়ে হাসি
অবতীর্ণ হও আসি,
রুধিয়া জানালা শাসি
বসি একবার।

বজ্ররবে সচকিত
কাঁপিবে গৃহের ভিৎ,
পথে শুনি কদচিৎ
        চক্র-খড়্খড় ।—
হারে রে ইংরাজ-রাজ
এ সাধে হানিলি বাজ,
শুধু কাজ, শুধু কাজ,
        শুধু ধড়্ফড়্ ।
আম্‌লা-শাম্‌লা-স্রোতে
ভাসাইলি এ ভারতে,
যেন নেই ত্রিজগতে
        হাসি গল্প গান—
নেই বাঁশি, নেই বঁধু,
নেই রে যৌবনমধু,
মুচেছে পথিকবধূ
        সজল নয়ান !
যেন রে শরম টুটে
কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি উঠে
        করে না আকুল—
কেবল জগৎটাকে
জড়ায়ে সহস্র পাকে
গবর্মেণ্টো প’ড়ে থাকে
        বিরাট বিপুল ।

বিষম রাক্ষস ওটা,
মেলিয়া আফিস-কোটা
গ্রাস করে গোটা-গোটা
বন্ধুবান্ধবেরে—

বৃহৎ বিদেশে দেশে
কে কোথা তলায় শেষে
কোথাকার সর্বনেশে
সার্বিসের ফেরে।

এ দিকে বাদর ভরা,
নবীন শ্যামল ধরা,
নিশিদিন ঝর্‌ঝরা
সঘন গগন।

এ দিকে ঘরের কোণে
বিরহিণী বাতায়নে,
গহন তমালবনে
নয়ন মগন।

হেঁট মুণ্ড করি হেঁট
মিছে করো অ্যাজিটেট,
খালি রেখে খালি পেট
লিখিছ কাগোজ—

এ দিকে গোরায় মিলে
কালা-বন্ধু লুটে নিলে,
তার বেলা কী করিলে
নাই কোনো খোঁজ।

দেখছি না আঁখি খুলে,
ম্যাঞ্চেস্টর-লিভার্‌পুলে
দিশি শিল্প জলে গুলে
করিল finish।

'আষাঢ়ে গল্প' সে কই,
সেও বুঝি গেল ওই—
আমাদের নিতান্তই
দেশের জিনিস।

আষাঢ় কাহার আশে
বর্ষে বর্ষে ফিরে আসে,
নয়নের নীরে ভাসে
দিবসরজনী।

আছে ভাব নাই ভাষা,
নাই শস্য আছে চাষা,
আছে নস্য নাই নাসা—
এও যে তেমনি।

তুমি আছ কোথা গিয়া,
আমি আছি শূন্যহিয়া,
কোথায় বা সে তাকিয়া
শোকতাপহরা।

সে তাকিয়া, গল্প-গীতি-
সাহিত্যচর্চার স্মৃতি
কত হাসি কত প্রীতি
কত তুলো -ভরা।

কোথায় সে যদুপতি
কোথা মথুরার পতি,
অথ চিন্তা করি ইতি
কুরু মনস্থির—

মায়াময় এ জগৎ
নহে সৎ, নহে সৎ—
যেন পদ্মপত্রবৎ,
তদুপরি নীর।

অতএব ত্বরা ক'রে
উত্তর লিখিবা মোরে,
সর্বদা নিকটে ঘোরে
কাল সে করাল;

(সুধী তুমি ত্যজি নীর
গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর)
এই তত্ত্ব এ চিঠির
জানিও moral।

৯

দার্জিলিং

১৮৮৭

এই তো দার্জিলিং এসে পড়লুম। পথে বে— খুব ভালোরকম behave করেছে। বড়ো একটা কাঁদে নি। খুব চেঁচামেচি গোলমালও করেছে, উলুও দিয়েছে, হাতও ঘুরিয়েছে এবং পাখিকে ডেকেছে, যদিও পাখি কোথায় দেখতে পাওয়া গেল না। সারাঘাটে স্টীমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গাম। রাত্রি দশটা, জিনিসপত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়েমানুষ পাঁচটা এবং পুরুষমানুষ একটি-মাত্র। নদী পেরিয়ে একটি ছোটো রেলগাড়িতে ওঠা গেল— তাতে চারটে ক'রে শয্যা, আমরা ছটি মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ladies' compartment'এ তোলা গেল। কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপ হল কাজে ঠিক তেমনটা হয় নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয় নি, তবু ন— বলেন আমি কিছুই করি নি, অর্থাৎ একখান আস্ত মানুষ একেবারে আস্ত রকম খেপলে যেরকমটা হয় সেইপ্রকার মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষমানুষের উপযুক্ত হ'ত। কিন্তু এই দু দিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নীচে ঠেলে গুঁজেছি, এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায় নি এবং পাবার জন্য এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্রসন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটে নি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েছে; বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। যখন চার দিকে চেয়ে

দেখি বাক্স, কেবলই বাক্স, ছোটো বড়ো মাঝারি, হাল্কা এবং ভারী, কাঠের এবং টিনের এবং পশুচর্মের এবং কাপড়ের— নীচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা— তখন আমার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে চলে যায় এবং তখন আমার শূন্যদৃষ্টি শুষ্কমুখ এবং দীনভাব দেখলে নিতান্ত কাপুরুষের মতো বোধ হয়; অতএব আমার সম্বন্ধে ন—র যা মত দাঁড়িয়েছে তা ঠিক। যাক, তার পরে আমি আর-একটা গাড়িতে গিয়ে শুলুম। সে গাড়িতে আর দুটি বাঙালি ছিলেন। তাঁরা ঢাকা থেকে আসছেন; তাঁদের মধ্যে একজনের মাথা টাকে প্রায় পরিপূর্ণ এবং ভাষা অত্যন্ত বাঁকা, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার পিতা দার্জিলিঙে ছিল?' লক্ষ্মী থাকলে এর যথোচিত উত্তর দিতে পারত। সে হয়তো বলত, 'তিনি দার্জিলিঙে ছিল, কিন্তু তখন দার্জিলিঙ বড়ো ঠাণ্ডা ছিলেন ব'লে তিনি বাড়ি ফিরে গেছে।' আমার উপস্থিতমত এরকম বাংলা জোগালো না।

সিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ক্রমাগত স—র উচ্ছ্বাস-উক্তি। 'ও মা' 'কী চমৎকার' 'কী আশ্চর্য' 'কী সুন্দর'— কেবলই আমাকে ঠেলে আর বলে, 'র—, দেখো দেখো।' কী করি, যা দেখায় তা দেখতেই হয়— কখনো বা গাছ, কখনো বা মেঘ, কখনো বা একটা দুর্জয় খাঁদা-নাক-ওয়ালী পাহাড়ী মেয়ে— কখনো বা এমন কত কী যা দেখতে-না-দেখতেই গাড়ি চ'লে যাচ্ছে এবং স— দুঃখ কচ্ছে যে র— দেখতে পেলে না। গাড়ি চলতে লাগল। ক্রমে ঠাণ্ডা, তার পরে মেঘ, তার পরে সর্দি, তার পরে হাঁচি, তার পরে শাল কম্বল বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কন্‌কন্‌, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার এবং ঠিক তার পরেই দার্জিলিং। আবার

সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা, সেই পুঁটুলি, মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে। ব্রেক থেকে জিনিসপত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপানো, সাহেবকে রশিদ দেখানো, সাহেবের সঙ্গে তর্কবিতর্ক, জিনিস খুঁজে না পাওয়া এবং সেই হারানো জিনিস পুনরুদ্ধারের জন্য বিবিধ বন্দোবস্ত করা, এতে আমার ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল।

১০

শিলাইদহ

১৮৮৮

শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর— ধূ ধূ করছে— কোথাও শেষ দেখা যায় না— কেবল মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়— আবার অনেক সময়ে বালিকে নদী ব'লে ভ্রম হয়। গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই— বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল-ধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুকনো সাদা বালি। পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমা আর নীচে অনন্ত পাণ্ডুরতা। আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য, নীচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা। এমনতরো desolation কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ পশ্চিমে মুখ ফেরাবামাত্র দেখা যায় স্রোতোহীন ছোটো নদীর কোল, ও পারে উঁচু পাড়, গাছপালা, কুটীর, সন্ধ্যাসূর্যালোকে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো। ঠিক যেন এক পারে সৃষ্টি এবং আর-এক পারে প্রলয়। সন্ধ্যাসূর্যালোক বলবার তাৎপর্য এই— সন্ধ্যার সময়ই আমরা বেড়াতে বেরই এবং সেই ছবিটাই মনে অঙ্কিত হয়ে আছে। পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই-যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে শতসহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎসংসারে এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্বদিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড

পাতা উল্টে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন — আর, এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর, আর ওই ছবির মতন পরপার, ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ, এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা! যাক, এ কথাগুলো রাজধানীতে অনেকটা 'পৈট্রি'র মতো শুনতে হবে, কিন্তু এখানকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমাত্র বেখাপ নয়।

সন্ধ্যাবেলা এই বৃহৎ চরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে অনুচর-সমেত ছেলেরা এক দিকে যায়, বলু এক দিকে যায়, আমি এক দিকে যাই, দুটি রমণী আর-এক দিকে যায়। ইতিমধ্যে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যায়, আকাশের সুবর্ণ আভা মিলিয়ে যায়, অন্ধকারে চার দিক অস্পষ্ট হয়ে আসে, ক্রমে আপনার পাশের ক্ষীণ ছায়া দেখে বুঝতে পারি, বাঁকা কৃশ চাঁদখানির আলো অল্প অল্প ফুটেছে। পাণ্ডুবর্ণ বালির উপরে এই পাণ্ডুবর্ণ জ্যোৎস্নায় চোখে আরও কেমন বিভ্রম জন্মিয়ে দেয় ; কোথায় বালি, কোথায় জল, কোথায় পৃথিবী, কোথায় আকাশ, নিতান্ত অনু-মান করে নিতে হয়। কাজেই সবটা জড়িয়ে ভারি একটা অবাস্তবিক মরীচিকা-জগতের মতো বোধ হয়। গতকল্য এই মায়া-উপকূলে অনেকক্ষণ ধ'রে বিচরণ ক'রে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি— আমি একখানি কেদারায় স্থির হয়ে বসলুম, Animal Magnetism -নামক একখানা অত্যন্ত ঝাপসা subject'এর বই একটা বাতির ঝাপসা আলোতে বসে পড়তে আরম্ভ করলুম, কিন্তু কেউ আর ফেরেন না। বইখানাকে খাটের উপরে উপুড় ক'রে রেখে বেরোলুম— উপরে উঠে চার দিকে চেয়ে কালো মাথার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলুম না। সমস্ত ফ্যাকাশে, ধূ ধূ করছে। একবার 'বলু' ব'লে পুরো জোরে চীৎকার করলুম— কণ্ঠস্বর হু হু করতে করতে দশ দিকে ছুটে গেল, কিন্তু কারও সাড়া পেলুম না। তখন বুকটা হঠাৎ চার দিক থেকে দমে গেল, একখানা বড়ো

খোলা ছাতা হঠাৎ বন্ধ ক'রে দিলে যেমনতরো হয়। গোফুর আলো নিয়ে বেরোল, প্রসন্ন বেরোল, বোটের মাঝিগুলো বেরোল, সবাই ভাগ ক'রে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চললুম— আমি এক দিকে 'বলু' 'বলু' ক'রে চীৎকার করছি— প্রসন্ন আর-এক দিকে ডাক দিচ্ছে 'ছোটো মা'— মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে মাঝিরা 'বাবু' 'বাবু' ক'রে ফুকরে উঠছে। সেই মরুভূমির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রে অনেকগুলো আর্তস্বর উঠতে লাগল। কারও সাড়াশব্দ নেই। গোফুর দুই-একবার অতি দূর থেকে হেঁকে বললে 'দেখতে পেয়েছি', তার পরেই আবার সংশোধন ক'রে বললে 'না না'। আমার মানসিক অবস্থাটা একবার কল্পনা ক'রে দেখো— কল্পনা করতে গেলে নিঃশব্দ রাত্রি, ক্ষীণ চন্দ্রালোক, নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য চর, দূরে গোফুরের চলনশীল একটি লণ্ঠনের আলো, মাঝে মাঝে এক-এক দিক থেকে কাতর কণ্ঠের আহ্বান এবং চতুর্দিকে তার উদাস প্রতিধ্বনি, মাঝে মাঝে আশার উন্মেষ এবং পরমুহূর্তেই সুগভীর নৈরাশ্য, এই সমস্তটা মনে আনতে হবে। অসম্ভব রকমের আশঙ্কাসকল মনে জাগতে লাগল। কখনো মনে হল চোরাবালিতে পড়েছে, কখনো মনে হল বলুর হয়তো হঠাৎ মূর্ছা কিম্বা কিছু-একটা হয়েছে— কখনো বা নানাবিধ শ্বাপদ জন্তুর বিভীষিকা কল্পনায় উদয় হতে লাগল। মনে মনে হতে লাগল 'আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ'। স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলুম। এমন সময়ে ঘণ্টাখানেক পরে রব উঠল এঁরা চড়া বেয়ে বেয়ে ও পারে গিয়ে পড়েছেন,আর ফিরতে পারছেন না। বোট ওপারে গেল; বোটলক্ষ্মী বোটে ফিরলেন; বলু বলতে লাগল, 'তোমাদের নিয়ে আমি আর কখনো বেরব না।' সকলেই অনুতপ্ত, শ্রান্তকাতর, সুতরাং আমার ভালো ভালো উপাদেয় ভর্ৎসনাবাক্য হৃদয়েই রয়ে গেল। পরদিন প্রাতঃকালে উঠেও কোনোমতেই রাগতে পারলুম না।

১১

কলিকাতা
জুন ১৮৮৯

গাড়ি ছাড়বার পর বে— চার দিক চেয়ে গম্ভীর হয়ে ব'সে রইল; ভাবলে এ সংসারে কোথা থেকে আগমন, কোথায় গতি, জীবনের উদ্দেশ্য কী— ভাবতে ভাবতে ক্রমে দেখলুম ঘন ঘন হাই তুলতে লাগল, তার পরে খানিক বাদে আয়ার কোলে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে নিদ্রা আরম্ভ ক'রে দিল। আমার মনেও সংসারের সুখদুঃখসম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তার উদয় হয়েছিল, কিন্তু ঘুম এল না। সুতরাং আপন মনে ভৈরবী আলাপ করতে লাগলুম। ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। মনে হয় একটা নিয়মের যন্ত্রহস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরাচ্ছে এবং সেই ঘর্ষণবেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। সকালবেলাকার সূর্যের সমস্ত আলো ম্লান হয়ে এসেছে, গাছপালা নিস্তব্ধ হয়ে কী যেন শুনছে, এবং আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, অর্থাৎ দূর আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন একটা অনিমেষ নীল চোখ কেবল ছলছল ক'রে চেয়ে আছে।

খিড়কি স্টেশনের কাছাকাছি আমাদের সেই আকের খেত, গাছের সার, টেনিস-খেত, কাঁচের জানলা-মোড়া বাড়ি দেখতে পেলুম, দেখে মনটা ক্ষণকালের জন্য কেমন ক'রে উঠল। এই এক আশ্চর্য। যখন এখানে বাস করতুম তখন এ বাড়ির উপরে যে সবিশেষ স্নেহ ছিল তা নয়, যখন এ বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলুম তখন যে সবিশেষ কাতর হয়েছিলুম তাও বলতে পারি নে, অথচ দ্রুতগতি ট্রেনের

বাতায়নে ব'সে যখন কেবল নিমেষের মতো দেখলুম সেই একলা বাড়ি তার খেলার জায়গা এবং ফাঁকা ঘরগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তখন সমস্ত হৃদয়টা বিদ্যুৎবেগে সেই বাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল, অমনি বুকের ভিতরে বাঁ দিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত ধক্ ক'রে একটা শব্দ হল, হুস্ ক'রে গাড়ি চ'লে গেল, আকের খেত মিলিয়ে গেল— বাস্, সমস্ত ফুরোল— কেবল হঠাৎ ঘা খাওয়ার দরুন মনের ছোটো বড়ো দু চারটে তার প্রায় দেড় সুর আন্দাজ নেবে গেল। কিন্তু গাড়ির এঞ্জিন এ-সকল বিষয়ে বড়ো একটা চিন্তা করে না, সে লোহার রাস্তার উপর দিয়ে এক রোখে চ'লে যায়, কোন্ লোক কোথায় কী ভাবে যাচ্ছে, সে বিষয়ে তার খেয়াল করবার সময় নেই— সে কেবল গল্ গল্ ক'রে জল খায়, হুস্ হুস্ ক'রে ধোঁওয়া ছাড়ে, গাঁ গাঁ ক'রে চীৎকার করে, এবং গড়্ গড়্ ক'রে চ'লে যায়। সংসারের গতির সঙ্গে এর সুন্দর তুলনা দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু সেটা এত পুরোনো এবং অনাবশ্যক যে কেবল একবার নির্দেশ ক'রে ক্ষান্ত থাকা গেল। খাণ্ডালার কাছাকাছি এসে মেঘ এবং বৃষ্টি। সেই-সব পাহাড়গুলোর উপরে মেঘ জমে ঝাপ্সা হয়ে গেছে— ঠিক যেন কে পাহাড় এঁকে তার পরে রবার দিয়ে ঘসে দিয়েছে; খানিক খানিক outline দেখা যাচ্ছে এবং খানিকটা পেন্সিলের দাগ চার দিকে ধেবড়ে গেছে। অবশেষে গাড়ির ঘণ্টা দিলে— দূর থেকে গাড়ির নিদ্রাহীন লাল চক্ষু দেখা গেল; ধরণী থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল; স্টেশনের কর্তারা চটি জুতো, ঘুন্টি-দেওয়া চাপকান এবং টিকির উপরে তকমা-দেওয়া গোল টুপি প'রে নানা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল— বিপুল হাত-ল্যাণ্ঠন চার দিকে আলো নিক্ষেপ করতে লাগল— খানসামাবর্গ সচকিত হয়ে যে যার জিনিসপত্র আগলে দাঁড়াল, বে— ঘুমোতে লাগল। গাড়িতে ওঠা

গেল।··· বে— অকারণে খুঁৎ খুঁৎ আরম্ভ করলে— বেলা বাড়তে লাগল, যদিও রোদ্দুর নেই তবুও গরম বোধ হতে লাগল, কিন্তু সময় আর কাটে না। প্রত্যেক মিনিটকে যেন স্পর্শ ক'রে ঠেলে ঠেলে এগোতে হচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে খানিক দূর গিয়ে ঘোরতর বৃষ্টি আরম্ভ হল— চার দিক বন্ধ ক'রে কাঁচের জানলার কাছে ব'সে মেঘবৃষ্টি দেখতে বেশ লাগল। এক জায়গায় একটা বর্ষার নদীর কাণ্ড যে দেখলুম সে আর কী বলব— সে একেবারে ফুলে ফেঁপে, ফেনিয়ে পাকিয়ে ঘুলিয়ে, ছুটে, মাথা খুঁড়ে, পাথরগুলোর উপরে প'ড়ে আছড়ে-বিছড়ে তাদের ডিঙিয়ে, তাদের চার দিকে ঘুরপাক খেয়ে একটা কাণ্ড করতে লাগল। এরকম উন্মত্ততা আর কোথাও দেখি নি। সোহাগপুরে বিকেলে এসে যখন খেলুম তখন বৃষ্টি থেমেছে— যখন গাড়ি ছাড়লে তখন দেখলুম সূর্য অত্যন্ত রাঙা হয়ে মেঘের মধ্যে অস্ত যাচ্ছে। আমি ভাবছিলুম, খাওয়া-দাওয়া গল্পসল্প খেলাধুলো পড়াশুনোর মধ্যে আর সবার সময় কেবল অলক্ষিতভাবে কেটে যাচ্ছে, সময় তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে— তার অস্তিত্বই তারা টের পাচ্ছে না— আর আমি সময়ের উপরে সাঁতার কেটে চলেছি, সমস্ত অগাধ সময়টা আমার বুকে মুখে সর্বাঙ্গে লাগছে।··· যথাসময়ে হাওড়ায় গাড়ি গিয়ে পৌঁছল। প্রথমে বাড়ির জমাদার, তার পরে যো—, তার পরে স—, একে একে দৃষ্টিপথে পড়ল। তার পরে সেকেণ্ড্ ক্লাসের সেক্‌রা গাড়ির ছাতের উপরে গুটানো বিছানা, আয়ার দোম্‌ড়ানো টিনের বাক্স এবং নাবার টব (তার মধ্যে দুধের বোতল, লোটা, হাঁড়ি, টিন্‌পট, পুঁটুলি ইত্যাদি) চাপিয়ে বাড়ি পৌঁছনো গেল। একটা কলরব, লোকের ভিড়, দারোয়ানদের সেলাম, চাকরদের প্রণাম, সরকারদের

নমস্কার, আমাদের মধ্যে কে মোটা হয়েছি কে রোগা হয়েছি সে সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ মতভেদ, বে—কে নিয়ে স্ব— এণ্ড্ কোম্পানির লুটোপুটি, চায়ের টেবিলে লোকসমাগম, স্নান, আহার ইত্যাদি।

১২

সাজাদপুর

জানুয়ারি ১৮৯০

—কাজেই দুপুর বেলা পাগড়ি প'রে, কার্ডে নাম লিখে, পাল্‌কি চ'ড়ে জমিদারবাবু চললেন। সাহেব তাঁবুর বারান্দায় ব'সে বিচার করছেন, দক্ষিণ পার্শ্বে পুলিসের চর। বিচারপ্রার্থীর দল মাঠে ঘাটে গাছতলায় প'ড়ে অপেক্ষা ক'রে আছে— একেবারে তাঁর নাকের সাম্‌নে পাল্‌কি নাবালে, সাহেব খাতির ক'রে চৌকিতে বসালেন। ছোক্‌রা-হেন, গোঁফের রেখা উঠছে— চুল খুব কটা, মাঝে মাঝে একটু একটু কালো চুলের তালি দেওয়া— হঠাৎ মনে হয় বুড়ো মানুষ, অথচ মুখ নিতান্ত কাঁচা। সাহেবকে বললুম, কাল রাত্রে আমার সঙ্গে খেতে এসো। তিনি বললেন, আমি আজই আর-এক জায়গায় যাচ্ছি, pig-sticking'এর জোগাড় করতে। বাড়ি চলে এলুম। ভয়ানক মেঘ ক'রে এল, ঘোরতর ঝড়, মুষলধারে বৃষ্টি। বই ছুঁতে ইচ্ছে করছে না, কিছু লেখা অসম্ভব— মনের মধ্যে যাকে কবিত্বের ভাষায় বলে, কী যেন কী ইত্যাদি। এ ঘর থেকে ও ঘরে পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলুম। অন্ধকার হয়ে এসেছে— গড়্‌গড়্‌ শব্দে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুৎ— হু হু ক'রে এক-একটা বাতাসের দমকা আসছে আর আমাদের বারান্দার সামনের বড়ো নিচুগাছটার ঘাড় ধ'রে যেন তার দাড়ি-সুদ্ধ মাথাটা নাড়িয়ে দিচ্ছে। দেখতে দেখতে বৃষ্টির জলে আমাদের শুকনো খালটা প্রায় পূরে এল। এই রকম ক'রে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আমার মনে হল, ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে এই বাদলায় আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করা আমার কর্তব্য। চিঠি লিখে দিলুম। চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে ঘর তদারক করতে গিয়ে দেখি, সে ঘরে

ছুটো বাঁশের ঝোলার উপর তাকিয়া গদি ময়লা-লেপ টাঙানো।—
চাকরদের গুল টিকে তামাক— তাদেরই ছুটো কাঠের সিন্ধুক—
তাদেরই মলিন লেপ, ওয়াড়হীন তৈলাক্ত বালিশ ও মসীবর্ণ মাছুর,
এক টুকরো ছেঁড়া চট ও তার উপরে বিচিত্রজাতীয় মলিনতা—
কতকগুলো প্যাক্‌বাক্সর মধ্যে নানাবিধ জিনিসের ভগ্নাবশেষ,
যথা মর্‌চেপড়া কাৎলির ঢাকনি, তলাহীন ভাঙা লোহার উন্থন,
অত্যন্ত ময়লা একটা দস্তার চাদানি, ভাঙা সেজের কাঁচ ও ময়লা
শামাদান, ছুটো অকর্মণ্য ফিল্‌টার, meatsafe, একটা স্থপ প্লেটে
খানিকটা পাৎলা গুড়— ধুলো পড়ে পড়ে সেটা গাঢ় হয়ে এসেছে—
গোটাকতক ময়লা কালীবর্ণ ভিজে ঝাড়ন, কোণে বাসন ধোবার
গাম্‌লা, গোফুর মিঞার একটা ময়লা কোর্তা এবং পুরোনো
মক্‌মলের skull-cap, জলের দাগ তেলের দাগ ছুধের দাগ কালো
দাগ brown দাগ সাদা দাগ এবং নানা মিশ্রিত দাগ -বিশিষ্ট
আয়নাহীন একটা জীর্ণ পোকাকাটা dressing table— তার
পায়াক'টা ভাঙা, আয়নাটা অন্যত্র দেয়ালে ঠেসান-দেওয়া, তার
খোপের মধ্যে ধুলো, খড়্‌কে, ন্যাপ্‌কিন, পুরোনো তালা, ভাঙা
গেলাসের তলা এবং সোডাওয়াটার-বোতলের তার, কতকগুলো
খাটের খুরো ভাঙা। ব্যাপার দেখে আমার চক্ষুস্থির— 'ডাক্
লোকজন, নিয়ে আয় নায়েব, ডেকে আন্ খাজাঞ্চি, জোগাড় কর্
কুলি, আন্ ঝাঁটা, আন্ জল, মই লাগা, দড়ি খোল্, বাঁশ খোল্,
তাকিয়া লেপ কাঁথা টেনে ফেল্, ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো
খুঁটে খুঁটে তোল্, দেয়ালের পেরেকগুলো একে একে উপড়ে
ফেল্— ওরে তোরা সব হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন, নে-না
একটা একটা ক'রে জিনিস নে-না— ওরে ভাঙলে রে সব ভাঙলে—
ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ, তিনটে সেজ ভেঙে চুরমার— খুঁটে খুঁটে তোল্।'—

ভাঙা চুপড়িগুলো এবং ছেঁড়া চটটা বহুদিনসঞ্চিত ধুলো-সমেত নিজের হাতে টেনে ফেলে দিলুম— নীচে থেকে পাঁচ-ছটা আর্‌সলা সপরিবারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন; তাঁরা আমারই সঙ্গে একান্নবর্তী হয়ে বাস করছিলেন, আমার গুড় আমার পাঁউরুটি এবং আমারই নতুন জুতোর বার্নিশ তাঁদের উপজীবিকা ছিল। সাহেব লিখলেন, 'আমি এখনি যাচ্ছি। বড়ো বিপদে পড়েছি।' 'ওরে, এল রে এল, চট্‌পট্‌ কর্‌।' তার পরে— ঐ এসেছে সাহেব। তাড়াতাড়ি চুল দাড়ি সমস্ত ঝেড়ে ফেলে ভদ্রলোক হয়ে, যেন কোনো কাজ ছিল না, যেন সমস্ত দিন আরামে বসেছিলুম, এইরকম ভাবে হলের ঘরে ব'সে রইলুম; সাহেবের সঙ্গে ঈষৎ হেসে হাত নাড়ানাড়ি ক'রে অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে গল্প করতে লাগলুম— সাহেবের শোবার ঘরে কী হল এই চিন্তা ক্রমাগত মনের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। গিয়ে দেখলুম এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে; রাত্তিরটা ঘুমিয়ে কাটতেও পারে যদি না সেই গৃহহীন আর্‌সুলো গুলো রাত্তিরে তাঁর পায়ের তেলোয় সুড়্‌সুড়ি দেয়।

১৩

লণ্ডন

১০ অক্টোবর ১৮৯০

মানুষ কি লোহার কল যে ঠিক নিয়ম-অনুসারে চলবে? মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড-কারখানা, তার এত দিকে গতি এবং এত রকমের অধিকার যে এ দিকে ও দিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই তো আমাদের জীবনের গতিশক্তি— সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ-পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত ক'রে তুলছে। নদী যদি প্রতি পদে বলে, 'কই সমুদ্র কোথায়, এ যে মরুভূমি, ঐ যে অরণ্য, ঐ যে বালির চড়া, আমাকে যে শক্তি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে বুঝি আমাকে ভুলিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে'— তা হলে তার যেরকম ভ্রম হয় প্রবৃত্তির উপরে একান্ত অবিশ্বাস করলে আমাদেরও কতকটা সেইরকম ভ্রম হয়। আমরাও প্রতিদিন বিচিত্র সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছি, আমাদের শেষ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে, কিন্তু যিনি আমাদের অনন্ত জীবনের মধ্যে প্রবৃত্তি-নামক প্রচণ্ড গতিশক্তি দিয়েছেন তিনিই জানেন তার দ্বারা আমাদের কিরকম ক'রে চালনা করবেন। আমাদের সর্বদা এই একটা মস্ত ভুল হয় যে, আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের যেখানে নিয়ে এসেছে সেইখানেই বুঝি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে; আমরা তখন জানতে পারি নে সে আমাদের তার মধ্যে থেকে টেনে তুলবে। নদীকে যে শক্তি মরুভূমির মধ্যে নিয়ে আসে সেই শক্তিই সমুদ্রের মধ্যে

নিয়ে যায়। ভ্রমের মধ্যে যে ফেলে ভ্রম থেকে সেই টেনে নিয়ে যায়— এই রকম করেই আমরা চলছি। যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনীশক্তির প্রাবল্য নেই,যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে সুখী হতে পারে, সাধু হতে পারে, এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বলতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশি নেই।

১৪

পতিসর
১৮৯১

আমার বোট কাছারির কাছ থেকে অনেক দূরে এনে একটি নিরিবিলি জায়গায় বেঁধেছি। এ দেশে গোলমাল কোথাও নেই, ইচ্ছে করলেও পাওয়া যায় না, কেবল হয়তো অন্যান্য বিবিধ জিনিসের সঙ্গে হাটে পাওয়া যেতে পারে। আমি এখন যেখানে এসেছি এ জায়গায় অধিকন্তু মানুষের মুখ দেখা যায় না। চারি দিকে কেবল মাঠ ধূ ধূ করছে; মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের গোড়াগুলিতে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন। সমস্ত দিনের পর সূর্যাস্তের সময় এই মাঠে কাল একবার বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষরেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চারি দিক কী যে সুন্দর হয়ে উঠল সে আর কী বলব! বহু দূরে একেবারে দিগন্তের শেষ প্রান্তে একটু গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল; সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল, নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল, মনে হল, ঐখানে যেন সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখানে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিল ভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন ক'রে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিঁদুর প'রে বধূর মতো কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে, এবং বসে বসে পা দুটি মেলে তারার মালা গাঁথে এবং গুন্‌গুন্ স্বরে স্বপ্ন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে— একটি কোমল বিষাদ, ঠিক অশ্রুজল নয়, একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নীচে গভীর ছল্‌ছলে ভাবের মতো। এমন মনে করা যেতে পারে— মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপুলে এবং কোলাহল এবং ঘরকর্‌নার কাজ নিয়ে থাকে; যেখানে একটু ফাঁকা,

একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে, সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে; এইজন্যে আমাদের পুরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হা-হা-ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ; তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে। কাল সন্ধের সময় নির্জন মাঠের মধ্যে পুরবী বাজছিল, পাঁচ-ছ ক্রোশের মধ্যে কেবল আমি একটি প্রাণী বেড়াচ্ছিলুম, এবং আর-একটি প্রাণী বোটের কাছে পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে অত্যন্ত সংযত ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার বাঁ পাশে ছোট্টো নদীটি দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে এঁকেবেঁকে খুব অল্প দূরেই দৃষ্টিপথের বার হয়ে গেছে; জলে ঢেউয়ের রেখামাত্র ছিল না, কেবল সন্ধ্যার আভা অত্যন্ত মুমূর্ষু হাসির মতো খানিক ক্ষণের জন্যে লেগেছিল। যেমন প্রকাণ্ড মাঠ তেমনি প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতা; কেবল এক-রকম পাখি আছে তারা মাটিতে বাসা ক'রে থাকে, সেই পাখি যত অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল তত আমাকে তার নিরালা বাসার কাছে ক্রমিক আনাগোনা করতে দেখে ব্যাকুল সন্দেহের স্বরে টী-টী করে ডাকতে লাগল। ক্রমে এখনকার কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো ঈষৎ ফুটে উঠল। বরাবর নদীর ধারে ধারে মাঠের প্রান্ত দিয়ে একটা সংকীর্ণ পদচিহ্ন চলে গেছে, সেইখানে নতশিরে চলতে চলতে ভাবছিলুম।

১৫

কালিগ্রাম

৫ মাঘ ১৮৯১

বেশ কুঁড়েমি করবার মতো বেলাটা। কেউ তাড়া দেবার লোক নেই, তা ছাড়া প্রজা এবং কাজের ভিড় এখনো চতুর্দিকে ছেঁকে ধরে নি। সবসুদ্ধ খুব ঢিলে-ঢিলে একলা-একলা কী-এক-রকম মনে হচ্ছে। যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্যক কাজ ব'লে একটা কিছুই নেই— এমন-কি, নাইলেও চলে, না নাইলেও চলে, এবং ঠিক সময়মত খাওয়াটা কলকাতার লোকের মধ্যে প্রচলিত একটা বহু দিনের কুসংস্কার ব'লে মনে হয়। এখানকার চতুর্দিকের ভাবগতিকও সেইরকম। একটা ছোট্টো নদী আছে বটে কিন্তু তাতে কানাকড়ির স্রোত নেই, সে যেন আপন শৈবালদামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে অঙ্গবিস্তার ক'রে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছে যে যদি না চললেও চলে তবে আর চলবার দরকার কী। জলের মাঝে মাঝে যে লম্বা ঘাস এবং জলজ উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না। পাঁচটা-ছটা বড়ো বড়ো নৌকো সারি সারি বাঁধা আছে— তার মধ্যে একটার ছাতের উপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড় মুড়ে রোদ্দুরে নিদ্রা দিচ্ছে; আর-একটার উপর একজন ব'সে ব'সে দড়ি পাকাচ্ছে এবং রোদ পোহাচ্ছে, দাঁড়ের কাছে একজন আধ-বৃদ্ধ লোক অনাবৃত গাত্রে ব'সে অকারণে আমাদের বোটের দিকে চেয়ে আছে। ডাঙার উপরে নানান রকমের নানান লোক অত্যন্ত মৃদুমন্দ অলস চালে কেন যে আসছে, কেন যে যাচ্ছে, কেন যে বুকের মধ্যে নিজের দুটো হাঁটুকে আলিঙ্গন ক'রে ধ'রে উবু হয়ে বসে আছে, কেন যে অবাক হয়ে বিশেষ কোনো কিছুর দিকে না

তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। কেবল গোটাকতক পাতিহাঁসের ওরই মধ্যে একটু ব্যস্ত ভাব দেখা যাচ্ছে, তারা ভারি কলরব করছে, এবং ক্রমাগতই উৎসাহ-সহকারে জলের মধ্যে মাথা ডুবোচ্ছে, এবং তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে নিয়ে সবলে ঝাড়া দিচ্ছে। ঠিক মনে হচ্ছে, যেন তারা জলের নীচেকার নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার করবার জন্যে প্রতি ক্ষণেই গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং তার পরে সবেগে মাথা নেড়ে বলছে 'কিচ্ছুই না' 'কিচ্ছুই না'। এখানকার দিনগুলো এইরকম বারো ঘণ্টা পড়ে পড়ে কেবল রোদ পোহায়, এবং অবশিষ্ট বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়। এখানে সমস্ত ক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবল নিজের মনের ভাবগুলোকে বসে বসে দোলা দিতে ইচ্ছে করে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু গুন্‌গুন্ ক'রে গান গাওয়া যায়, মাঝে মাঝে বা ঘুমে চোখ একটু অলস হয়ে আসে। মা যেমন ক'রে শীতকালের সারা বেলা রোদ্‌দুরে পিঠ দিয়ে ছেলে কোলে ক'রে গুন্‌গুন্ স্বরে দোলা দেয়, সেইরকম।

পতিসর

৭ মাঘ ১৮৯১

ছোটো নদীটি ঈষৎ বেঁকে এইখানে একটুখানি কোণের মতো, একটু কোলের মতো তৈরি করেছে; দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে সেই কোলের কোণটুকুতে বেশ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি, একটু দূর থেকে আমাদের আর দেখা যায় না। নৌকাওয়ালারা উত্তর দিক থেকে গুন টেনে টেনে আসে, হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই এই জনহীন মাঠের ধারে অকারণে একটা মস্ত বোট বাঁধা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। 'হাঁ গা, কাদের বজরা গা?' 'জমিদার বাবুর।' 'এখানে কেন? কাছারির সামনে কেন বাঁধ নি?' 'হাওয়া খেতে এসেছেন।' এসেছি হাওয়ার চেয়ে আরো ঢের বেশি কঠিন জিনিসের জন্যে। যা হোক, এরকম প্রশ্নোত্তর প্রায় মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। এইমাত্র খাওয়া শেষ ক'রে বসেছি, এখন বেলা দেড়টা। বোট খুলে দিয়েছে, আস্তে আস্তে কাছারির দিকে চলেছে। বেশ একটু বাতাস দিচ্ছে। তেমন ঠাণ্ডা নয়, দুপুর বেলার তাতে অল্প গরম হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। সেই শৈবালের উপরে অনেকগুলো ছোটো ছোটো কচ্ছপ আকাশের দিকে সমস্ত গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। অনেক দূরে দূরে একটা একটা ছোটো ছোটো গ্রাম আসছে। গুটিকতক খোড়ো ঘর, কতকগুলি চালশূন্য মাটির দেয়াল, দুটো-একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ আমগাছ বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটাতিনেক ছাগল চরছে, গোটাকতক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে; নদী পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে, কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা

ঈষৎ ফাঁক ক'রে ধ'রে কলসী কাঁখে জমিদার বাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে, তার হাঁটুর কাছে আঁচল ধ'রে একটি সদ্যস্নাত তৈলচিক্কণ বিবস্ত্র শিশুও একদৃষ্টে বর্তমান পত্রলেখক-সম্বন্ধে কৌতূহল-নিবৃত্তি করছে; তীরে কতকগুলো নৌকো বাঁধা এবং একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন জেলেডিঙি অর্ধনিমগ্ন অবস্থায় পুনরুদ্ধারের প্রতীক্ষা করছে। তার পরে আবার অনেকটা দূর শস্যশূন্য মাঠ; মাঝে মাঝে কেবল দুই-একজন রাখাল-শিশুকে দেখতে পাওয়া যায়, এবং দুটো-একটা গোরু নদীর ঢালু তটের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এসে সরস তৃণ অন্বেষণ করছে দেখা যায়। এখানকার দুপুর বেলার মতো এমন নির্জনতা নিস্তব্ধতা আর কোথাও নেই।

১৭

কালিগ্রাম
জানুয়ারি ১৮৯১

কাল যখন কাছারি করছি, গুটি পাঁচ-ছয় ছেলে হঠাৎ অত্যন্ত সংযত ভাবে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে ; কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে না করতে একেবারে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আরম্ভ ক'রে দিলে, 'পিতঃ, অভাগ্য সন্তানগণের সৌভাগ্যবশতঃ জগদীশ্বরের কৃপায় প্রভুর পুনর্বার এতদ্দেশে শুভাগমন হইয়াছে।' এমনি ক'রে আধ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা ক'রে গেল ; মাঝে মাঝে মুখস্থ বক্তৃতা ভুলে যাচ্ছিল, আবার আকাশের দিকে চেয়ে সংশোধন ক'রে নিচ্ছিল। বিষয়টা হচ্ছে, তাদের স্কুলে টুল ও বেঞ্চির অপ্রতুল হয়েছে— 'সেই কাষ্ঠাসন-অভাবে আমরাই বা কোথায় উপবেশন করি, আমাদের পূজনীয় শিক্ষকমহাশয়ই বা কোথায় উপবেশন করেন, এবং পরিদর্শকমহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই বা কোথায় আসন দান করা যায় !' ছোট্টো ছেলের মুখে হঠাৎ এই অনর্গল বক্তৃতা শুনে আমার এমনি হাসি পাচ্ছিল। বিশেষত এই জমিদারি কাছারিতে, যেখানে অশিক্ষিত চাষারা নিতান্ত গ্রাম্য ভাষায় আপনাদের যথার্থ দারিদ্র্যদুঃখ জানায়, যেখানে অতিবৃষ্টি-দুর্ভিক্ষে গোরু বাছুর হাল লাঙল বিক্রি ক'রেও উদরান্নের অনটনের কথা শোনা যাচ্ছে, যেখানে 'অহরহ' শব্দের পরিবর্তে 'রহরহ', 'অতিক্রমের' স্থলে 'অতিক্রয়' ব্যবহার, সেখানে টুল বেঞ্চির অভাবে সংস্কৃত বক্তৃতা কানে এমনি অদ্ভুত শোনায়। অন্যান্য আমলা এবং প্রজারা এই ছোকরার ভাষার প্রতি এতাদৃশ দখল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল ; তারা মনে মনে আক্ষেপ করছিল, 'বাপ-মা'রা আমাদের যত্ন ক'রে লেখা-পড়া শেখায় নি, নইলে আমরাও জমিদারের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এই-

রকম শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করতে পারতুম।' আমি শুনতে পেলুম, একজন আর-একজনকে ঠেলে ঈষৎ বিদ্বেষের ভাবে বলছে, 'একে কে শিখিয়ে দিয়েছে।' আমি তার বক্তৃতা শেষ না হতেই তাকে থামিয়ে বললুম, 'আচ্ছা, তোমাদের টুল-বেঞ্চির বন্দোবস্ত ক'রে দেব।' তাতেও সে দমল না, সে যেখানে বক্তৃতা ভঙ্গ করেছিল সেইখান থেকে আবার আরম্ভ করলে— যদিও তার আবশ্যক ছিল না, কিন্তু শেষ কথাটি পর্যন্ত চুকিয়ে প্রণাম ক'রে বাড়ি ফিরে গেল। বেচারা অনেক কষ্টে মুখস্থ ক'রে এসেছিল, আমি তার টুল বেঞ্চি না দিলে সে ক্ষুণ্ণ হত না, কিন্তু তার বক্তৃতা কেড়ে নিলে বোধ হয় অসহ্য হত— সেইজন্যে যদিও আমার অনেক গুরুতর কাজ ছিল তবু খুব গম্ভীরভাবে আদ্যোপান্ত শুনে গেলুম।

১৮

কালিগ্রাম

জানুয়ারি ১৮৯১

ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ ক'রে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি! ওর এই গাছপালা নদী-মাঠ কোলাহল-নিস্তব্ধতা প্রভাত-সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন-কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম। স্বর্গ আর কী দিত জানি নে, কিন্তু এমন কোমলতা-দুর্বলতা-ময় এমন সকরুণ আশঙ্কা-ভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত? আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখ-দুঃখ-ময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই-সমস্ত দরিদ্র মর্তহৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে ক'রে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃাথবীর যত দূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে; যেন এর মনে মনে আছে, 'আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে; আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে; জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে।' এইজন্যে স্বর্গের উপর আড়ি ক'রে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরও বেশি ভালোবাসি; এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর ব'লেই।

১৯

সাজাদপুরের অনতিদূরে
১২ মাঘ ১৮৯১

এখনও পথে আছি। ভোর থেকে আরম্ভ ক'রে সন্ধ্যা সাতটা-আটটা পর্যন্ত ক্রমাগতই ভেসে চলেছি। কেবলমাত্র গতির কেমন একটা আকর্ষণ আছে— দু ধারের তটভূমি অবিশ্রাম চোখের উপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে, সমস্ত দিন তাই চেয়ে আছি, কিছুতে তার থেকে চোখ ফেরাতে পারছি নে ; পড়তে মন যায় না, লিখতে মন যায় না, কোনো কিছু কাজ নেই, কেবল চুপ করে চেয়ে বসে আছি। কেবল-যে দৃশ্যের বৈচিত্র্যের জন্যে তা নয়— হয়তো দু ধারে কিছুই নেই, কেবল তরুহীন তটের রেখামাত্র চ'লে গেছে, কিন্তু ক্রমাগতই চলছে এই হচ্ছে তার প্রধান আকর্ষণ। আমার নিজের কোনো চেষ্টা নেই, পরিশ্রম নেই, অথচ বাইরের একটা অশ্রান্ত গতি মনটাকে বেশ মৃদু প্রশান্তভাবে ব্যাপৃত করে রাখে। মনের পরিশ্রমও নেই, বিশ্রামও নেই, এই রকমের একটা ভাব। চৌকিতে বসে বসে অলস অন্যমনস্ক ভাবে পা-দোলানো যেরকম এও সেইরকম ; শরীরটা মোটের উপর বিশ্রাম করছে, অথচ শরীরের যে অতিরিক্ত উদ্যমটুকু কোনোকালে স্থির থাকতে চায় না, তাকেও একটা একঘেয়ে-রকম কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের কালিগ্রামের সেই মুমূর্ষুর নাড়ির মতো অতি ক্ষীণস্রোত নদী কাল কোন্ কালে ছাড়িয়ে এসেছি। সেই নদী থেকে ক্রমে একটা স্রোতস্বিনী নদীতে এসে পড়া গেল। সেটা বেয়ে ক্রমে এমন এক জায়গায় এসে পড়লুম যেখানে ডাঙায় জলে একাকার হয়ে গেছে। নদী এবং তীর উভয়ের আকার-প্রকারের ভেদ ক্রমশই ঘুচে গেছে, দুটি অল্প বয়সের ভাই-বোনের মতো। তীর এবং

জল মাথায় মাথায় সমান, একটুও পাড় নেই। ক্রমে নদীর সেই ছিপ্ছিপে আকারটুকু আর থাকে না, নানা দিকে নানা রকমে ভাগ হয়ে ক্রমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এই খানিকটা সবুজ ঘাস, এই খানিকটা স্বচ্ছ জল। দেখে পৃথিবীর শিশুকাল মনে পড়ে, অসীম জলরাশির মধ্যে যখন স্থল সবে একটুখানি মাথা তুলেছে, জলস্থলের অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায় নি। চারি দিকে জেলেদের বাঁশ পোঁতা, জেলেদের জাল থেকে মাছ ছোঁ মেরে নেবার জন্যে চিল উড়ছে, পাঁকের উপরে নিরীহ বক দাঁড়িয়ে আছে, নানা রকমের জলচর পাখি, জলে শ্যাওলা ভাসছে, মাঝে মাঝে পাঁকের মধ্যে অযত্নসম্ভূত ধানের গাছ, স্থির জলের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়ছে। ভোরের বেলা বোট ছেড়ে দিয়ে কাঁচিকাঠায় গিয়ে পড়া গেল। একটি বারো-তেরো হাত সংকীর্ণ খালের মতো ক্রমাগত এঁকে বেঁকে গেছে, সমস্ত বিলের জল তারই ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে ; এর মধ্যে আমাদের এই প্রকাণ্ড বোট নিয়ে বিষম কাণ্ড— জলের স্রোত বিদ্যুতের মতো বোটটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দাঁড়িরা লগি হাতে ক'রে সামলাবার চেষ্টা করছে পাছে ডাঙার উপরে বোটটাকে আছড়ে ফেলে। এ দিকে হু হু ক'রে বাদলার বাতাস দিচ্ছে, ঘন মেঘ করে রয়েছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, শীতে সবাই কাঁপছে। ক্রমে খোলা নদীতে এসে পড়লুম। শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন ভিজে দিন ভারি বিশ্রী লাগে। সকাল বেলাটা তাই নিতান্ত নির্জীবের মতো ছিলুম। বেলা দুটোর সময় রোদ উঠল। তার পর থেকে চমৎকার। খুব উঁচু পাড়ে বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয় এমন শান্তিময়, এমন সুন্দর, এমন নিভৃত— দুই ধারে স্নেহসৌন্দর্য বিতরণ ক'রে নদীটি বেঁকে বেঁকে চ'লে গেছে, আমাদের বাংলাদেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী

নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে এবং জলের ধারে বসে বসে অতি যত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুলতে চায় তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে।

আজ সন্ধ্যাবেলায় নদীর বাঁকের মুখে ভারি একটি নিরালা জায়গায় বোট লাগিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, জলে একটিও নৌকো নেই— জ্যোৎস্না জলের উপর ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে— পরিষ্কার রাত্রি, নির্জন তীর, বহু দূরে ঘনবৃক্ষবেষ্টিত গ্রামটি সুষুপ্ত, কেবল ঝিঁঝিঁ ডাকছে, আর কোনো শব্দ নেই।

২০

সাজাদপুর

ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

আমার সামনে নানা-রকম গ্রাম্য দৃশ্য দেখতে পাই, সেগুলো আমার দেখতে বেশ লাগে। ঠিক আমার জানলার সুমুখে খালের ও পারে একদল বেদে বাখারির উপর খানকতক দর্‌মা এবং কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গুটিতিনেক খুব ছোট্টো ছোট্টো ছাউনিমাত্র— তার মধ্যে মানুষের দাঁড়াবার জো নেই— ঘরের বাইরেই তাদের সমস্ত গৃহকর্ম চলে, কেবল রাত্তিরে সকলে মিলে কোনো প্রকারে জড়পুঁটুলি হয়ে সেই ঘরের মধ্যে ঘুমোতে যায়। বেদে জাতটাই এইরকম।— কোথাও বাড়ি ঘর নেই, কোনো জমিদারকে খাজনা দেয় না; একদল শুয়োর, গোটা-ছুয়েক কুকুর এবং কতকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পুলিস সর্বদা এদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আমাদের এখানে যারা আছে, আমি জানলায় দাঁড়িয়ে প্রায় তাদের কাজকর্ম দেখি। এদের দেখতে মন্দ নয়, হিন্দুস্থানি ধরনের। কালো বটে, কিন্তু বেশ শ্রী আছে, বেশ জোরালো সুডোল শরীর। মেয়েদেরও বেশ দেখতে— ছিপ্‌ছিপে, লম্বা, আঁটসাঁট, অনেকটা ইংরেজ মেয়েদের মতো শরীরের স্বাধীন ভঙ্গী, অর্থাৎ বেশ অসংকোচ চাল-চলন, নড়াচড়ার মধ্যে সহজ সরল দ্রুত ভাব আছে— আমার তো ঠিক মনে হয় কালো ইংরেজের মেয়ে। পুরুষটা রান্না চড়িয়ে দিয়ে ব'সে ব'সে বাঁশ চিরে চিরে ধামা চাঙারি কুলো প্রভৃতি তৈরি করছে; মেয়েটা কোলের উপর একটি ছোট্টো আয়না নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে একটি গামছা ভিজিয়ে মুখটি বিশেষ যত্নের সঙ্গে দু-তিন বার ক'রে মুছলে, তার পরে আঁচল-টাঁচলগুলো একটু

ইতস্তত টেনেটুনে সেরেসুরে নিয়ে বেশ ফিট্‌ফাট হয়ে পুরুষটার কাছে উবু হয়ে বসল, তার পরে একটু-আধটু কাজে হাত দিতে লাগল। এরা নিতান্তই মাটির সন্তান, নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে— যেখানে-সেখানে জন্মাচ্ছে, পথে পথেই বেড়ে উঠছে এবং যেখানে-সেখানে মরছে ; এদের ঠিক অবস্থাটা, ঠিক মনের ভাবটা ভারি জানতে ইচ্ছে করে। দিনরাত খোলা আকাশে, খোলা বাতাসে, অনাবৃত মৃত্তিকার উপরে এ একরকম নূতন রকমের জীবন, অথচ এরই মধ্যে কাজকর্ম ভালোবাসা ছেলেপুলে ঘরকর্‌না সমস্তই আছে। কেউ যে একদণ্ড কুঁড়ে হয়ে ব'সে আছে তা দেখলুম না, একটা না একটা কাজে আছেই। যখন হাতের কাজ ফুরোল তখন খপ ক'রে একজন মেয়ে আর-একজন মেয়ের পিঠের কাছে ব'সে তার ঝুঁটি খুলে দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে উকুন বাছতে আরম্ভ ক'রে দিলে এবং বোধ করি সেই সঙ্গে ঐ ছোটো তিনটে দর্মা-ছাউনির ঘরকন্না সম্বন্ধে এক এক ক'রে গল্প জুড়ে দিলে— সেটা আমি এত দূর থেকে ঠিক নিশ্চিত বলতে পারি নে, তবে অনেকটা অনুমান করা যেতে পারে। আজ সকালবেলায় এই নিশ্চিন্ত বেদের পরিবারের মধ্যে একটা বিষম অশান্তি এসে জুটেছিল। তখন বেলা সাড়ে আটটা নটা হবে— রাত্রে শোবার কাঁথা এবং ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া-গুলো বের ক'রে এনে দর্মার চালের উপর রোদ্‌দুরে মেলে দিয়েছে। শুয়োরগুলো বাচ্ছাকাচ্ছা-সমেত সকলে গায়ে গায়ে লাগাও হয়ে একটা গর্তর মতো ক'রে তার মধ্যে মস্ত এক তাল কাদার মতো পড়েছিল, সমস্ত রাত শীতের পর সকাল বেলাকার রোদ্‌দুরে বেশ একটু আরাম বোধ করছিল— হঠাৎ তাদেরই এক-পরিবার-ভুক্ত কুকুর দুটো এসে ঘাড়ের উপর প'ড়ে ঘেউ ঘেউ ক'রে তাদের উঠিয়ে দিলে। বিরক্তির স্বর প্রকাশ ক'রে তারা ছোটা-হাজরি-অন্বেষণে

চতুর্দিকে চলে গেল। আমি আমার ডায়ারি লিখছি এবং মাঝে মাঝে সম্মুখের পথের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে দেখছি— এমন সময় বিষম একটা হাঁক-ডাক শোনা গেল। আমি উঠে জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম বেদে-আশ্রমের সম্মুখে লোক জড়ো হয়েছে— এবং ওরই মধ্যে একটু ভদ্রগোছের একজন লাঠি আস্ফালন ক'রে বিষম গালমন্দ দিচ্ছে, কর্তা বেদে দাঁড়িয়ে নিতান্ত ভীত কম্পিত ভাবে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করছে। বুঝতে পারলুম, কী একটা সন্দেহের কারণ হয়েছে, তাই পুলিশের দারোগা এসে উপদ্রব বাধিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা ব'সে ব'সে আপন মনে বাঁখারি ছুলে যাচ্ছে, যেন সে একলা ব'সে আছে এবং কোথাও কিছু গোলমাল নেই। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে পরম নির্ভীক চিত্তে দারোগার মুখের সামনে বার বার বাহু আন্দোলন ক'রে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে। দেখতে দেখতে দারোগার তেজ প্রায় বারো-আনা পরিমাণ কমে গেল— অত্যন্ত মৃদু ভাবে দুটো-একটা কথা বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু একটুও অবসর পেলে না। যে ভাবে এসেছিল সে ভাব অনেকটা পরিবর্তন ক'রে ধীরে ধীরে চলে যেতে হল। অনেকটা দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'আমি এই ব'লে গেলাম, তোমাদের এখান হৎকে যাবার লাগবে।' আমি ভাবলুম, আমার বেদে প্রতিবেশীরা এখনি বুঝি খুঁটি দর্মা তুলে, পুঁটুলি বেঁধে, ছানাপোনা নিয়ে, শুয়োর তাড়িয়ে এখান থেকে প্রস্থান করবে। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই; এখনও তারা নিশ্চিন্ত ভাবে ব'সে ব'সে বাঁখারি চিরছে, রাঁধছে-বাড়ছে, উকুন বাচছে। আমার এই খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে নানা দৃশ্য দেখতে পাই। সব-সুদ্ধ বেশ লাগে— কিন্তু এক-একটা দেখে ভারি মন বিগড়ে যায়। গাড়ির উপর অসম্ভব ভার চাপিয়ে অসাধ্য রাস্তায় যখন

গোরুকে কাঠির বাড়ি খোঁচা দিতে থাকে .তখন আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। আজ সকালে দেখছিলুম, একজন মেয়ে তার একটি ছোটো উলঙ্গ শীর্ণ কালো ছেলেকে এই খালের জলে নাওয়াতে এনেছে— আজ ভয়ংকর শীত পড়েছে— জলে দাঁড় করিয়ে যখন ছেলেটার গায়ে জল দিচ্ছে তখন সে করুণ স্বরে কাঁদছে আর কাঁপছে, ভয়ানক কাশিতে তার গলা খন্ খন্ করছে ; মেয়েটা হঠাৎ তার গালে এমন একটা চড় মারলে যে আমি আমার ঘর থেকে তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলুম। ছেলেটা বেঁকে পড়ে হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল, কাশিতে তার কান্না বেধে যাচ্ছিল। তার পরে ভিজে গায়ে সেই উলঙ্গ কম্পান্বিত ছেলের নড়া ধরে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল। এই ঘটনাটা নিদারুণ পৈশাচিক ব'লে বোধ হল। ছেলেটা নিতান্ত ছোটো, আমার খোকার বয়সী। এরকম একটা দৃশ্য দেখলে হঠাৎ মানুষের যেন একটা ideal'এর উপর আঘাত লাগে, বিশ্বস্তচিত্তে চলতে চলতে খুব একটা হুঁচট লাগার মতো। ছোটো ছেলেরা কী ভয়ানক অসহায়— তাদের প্রতি অবিচার করলে তারা নিরুপায় কাতরতার সঙ্গে কেঁদে নিষ্ঠুর হৃদয়কে আরও বিরক্ত ক'রে তোলে, ভালো ক'রে আপনার নালিশ জানাতেও পারে না। মেয়েটা শীতে সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন ক'রে এসেছে আর ছেলেটার গায়ে এক টুকরো কাপড়ও নেই, তার উপরে কাশি, তার উপরে এই ডাকিনীর হাতের মার !

২১

সাজাদপুর
ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

এখানকার পোস্ট্‌মাস্টার এক-একদিন সন্ধের সময়ে এসে আমার সঙ্গে এইরকম ডাকের চিঠি যাতায়াত সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেন। আমাদের এই কুঠিবাড়ির এক তলাতেই পোস্ট্‌-আফিস, বেশ সুবিধে, চিঠি আসবামাত্রই পাওয়া যায়। পোস্ট্‌-মাস্টারের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে। বিস্তর অসম্ভব কথা বেশ গম্ভীর ভাবে ব'লে যান। কাল বলছিলেন, এ দেশের লোকের গঙ্গার উপর এমনি ভক্তি যে এদের কোনো আত্মীয় মরে গেলে তার হাড় গুঁড়ো ক'রে রেখে দেয়, কোনো কালে গঙ্গার জল খেয়েছে এমন লোকের যদি সাক্ষাৎ পায় তা হলে তাকে পানের সঙ্গে সেই হাড়গুঁড়ো খাইয়ে দেয় আর মনে করে তার আত্মীয়ের একটা অংশের গঙ্গালাভ হল। আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'এটা বোধ হয় গল্প।' তিনি খুব গম্ভীর ভাবে চিন্তা ক'রে স্বীকার করলেন, 'তা হতে পারে।'

২২

শিলাইদহ

ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

কাছারির পরপারের নির্জন চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। দিনটা এবং চারি দিকটা এমনি সুন্দর ঠেকছে সে আর কী বলব। অনেক দিন পরে আবার এই বড়ো পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখাসাক্ষাৎ হল। সেও বললে 'এই-যে'। আমিও বললুম 'এই-যে'। তার পরে দুজনে পাশাপাশি বসে আছি, আর কোনো কথাবার্তা নেই। জল ছল্ ছল্ করছে এবং তার উপরে রোদ্দুর চিক্ চিক্ করছে; বালির চর ধূ ধূ করছে, তার উপর ছোটো ছোটো বন-ঝাউ উঠেছে। জলের শব্দ, দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ ঝাঁ, এবং ঝাউ-ঝোপ থেকে দুটো-একটা পাখির চিক্ চিক্ শব্দ, সবসুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব। খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করছে— কিন্তু আর-কিছু নিয়ে নয়, এই জলের শব্দ, এই রোদ্দুরের দিন, এই বালির চর। মনে হচ্ছে রোজই ঘুরে-ফিরে এই কথাই লিখতে হবে; কেননা, আমার এই একই নেশা, আমি বার বার এই এক কথা নিয়েই বকি।— বড়ো বড়ো নদী কাটিয়ে আমাদের বোটটা একটা ছোটো নদীর মুখে প্রবেশ করছে। দুই ধারে মেয়েরা স্নান করছে, কাপড় কাচছে, এবং ভিজে কাপড়ে এক-মাথা ঘোমটা টেনে জলের কলসী নিয়ে ডান হাত দুলিয়ে ঘরে চলেছে; ছেলেরা কাদা মেখে জল ছুঁড়ে মাতামাতি করছে এবং একটা ছেলে বিনা সুরে গান গাচ্ছে, 'একবার দাদা ব'লে ডাক্ রে লক্ষ্মণ!' উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে অদূরবর্তী গ্রামের খড়ের চাল এবং বাঁশবনের ডগা দেখা যাচ্ছে। আজ মেঘ কেটে গিয়ে রোদ্দুর দেখা দিয়েছে। যে মেঘগুলো আকাশের প্রান্তভাগে অবশিষ্ট আছে সেগুলো সাদা

তুলোর রাশের মতো দেখাচ্ছে। বাতাস ঈষৎ গরম হয়ে ব'চ্ছে। ছোটো নদীতে বড়ো বেশি নৌকো নেই; হুটো-একটা ছোটো ডিঙি শুকনো গাছের ডাল এবং কাঠকুটো বোঝাই নিয়ে শ্রান্ত ভাবে ছপ্ ছপ্ দাঁড় ফেলে চলেছে; ডাঙায় বাঁশের উপর জেলেদের জাল শুকোচ্ছে— পৃথিবীর সকাল বেলাকার কাজকর্ম খানিক ক্ষণের জন্যে বন্ধ হয়ে আছে।

২৩

শিলাইদহ

জলপথে

১৬ জুন ১৮৯১

এখন পাল তুলে যমুনার মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমার বাঁ ধারে মাঠে গোরু চরছে, দক্ষিণ ধারে একেবারে কূল দেখা যাচ্ছে না। নদীর তীব্র স্রোতে তীর থেকে ক্রমাগতই ঝুপ্ ঝুপ্ করে মাটি খসে পড়ছে। আশ্চর্য এই, এত বড়ো প্রকাণ্ড এই নদীটার মধ্যে আমাদের বোট ছাড়া আর দ্বিতীয় একটি নৌকো দেখা যাচ্ছে না— চারি দিকে জলরাশি ক্রমাগতই ছল্ ছল্ খল্ খল্ শব্দ করছে, আর বাতাসের হুহু শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাল সন্ধের সময় একটা চরের উপর বোট লাগিয়েছিলুম— নদীটি ছোট্টো, যমুনার একটি শাখা; এক পারে বহু দূর পর্যন্ত সাদা বালি ধূ ধূ করছে, জনমানবের সম্পর্ক নেই, আর-এক পারে সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং বহু দূরে একটি গ্রাম। আর কত বার বলব— এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধেটা কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ! সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়। ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হয়ে এল, কেবল জলের রেখা এবং তটের রেখায় একটা প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল, এবং গাছপালা কুটীর সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপসা জগৎ চোখের সামনে বিস্তৃত পড়ে ছিল, তখন ঠিক মনে হচ্ছিল, এ সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার অপরূপ জগৎ— যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠে নি, অল্পদিন হল সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতিবিস্ময়পূর্ণ ছমছম্ নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন, যখন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে মায়াপুরে

পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, যখন রাজপুত্র এবং পাত্তরের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে— এ যেন তখনকার সেই অতিসুদূরবর্তী অর্ধ-অচেতনায়-মোহাচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর, এবং মনে করা যেতেও পারে আমি সেই রাজপুত্র— একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এই ছোটো নদীটি সেই তেরো নদীর মধ্যে একটা নদী, এখনো সাত সমুদ্র বাকি আছে ; এখনও অনেক দূর, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি ; এখনও কত অজ্ঞাত নদীতীরে, কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায় কত ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা ক'রে আছে ; তার পরে হয়তো অনেক ভ্রমণ, অনেক রোদন, অনেক বেদনের পর হঠাৎ একদিন 'আমার কথাটি ফুরোল, নটে শাকটি মুড়োল'— হঠাৎ মনে হবে, এতক্ষণ একটা গল্প বলছিলুম ; এখন গল্প ফুরিয়েছে, এখন অনেক রাত্রি, এখন ছোটো ছেলের ঘুমোবার সময়।

২৪

—চুহালি
১৯ জুন ১৮৯১

কাল পনেরো মিনিট বাইরে বসতে না বসতে পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ করে এল। খুব কালো গাঢ় আলুথালু রকমের মেঘ, তারই মাঝে মাঝে চোরা আলো প'ড়ে রাঙা হয়ে উঠেছে। দুটো-একটা নৌকো তাড়াতাড়ি যমুনা থেকে এই ছোটো নদীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে দড়িদড়া নোঙর দিয়ে মাটি আঁকড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। যারা মাঠে শস্য কাটতে এসেছিল তারা মাথায় এক এক বোঝা শস্য নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে, গোরুও ছুটেছে, তার পিছনে পিছনে বাছুর লেজ নেড়ে নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়বার চেষ্টা করছে। খানিক বাদে একটা আক্রোশের গর্জন শোনা গেল; কতকগুলো ছিন্নভিন্ন মেঘ ভগ্নদূতের মতো সুদূর পশ্চিম থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল— তার পরে বিদ্যুৎ বজ্র ঝড় বৃষ্টি সমস্ত একসঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা তুর্কি-নাচন নাচতে আরম্ভ ক'রে দিলে, বাঁশগাছগুলো হাউহাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ঝড় যেন সোঁ সোঁ ক'রে সাপুড়ের মতো বাঁশি বাজাতে লাগল, আর জলের ঢেউগুলো তিন লক্ষ সাপের মতো ফণা তুলে তালে তালে নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিলে। কালকের সে যে কী কাণ্ড সে আর কী বলব। বজ্রের যে শব্দ সে আর থামে না, আকাশের কোন্‌খানে যেন একটা আস্ত জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বোটের খোলা জানলার উপর মুখ রেখে প্রকৃতির সেই রুদ্রতালে আমিও বসে বসে মনটাকে দোলা দিচ্ছিলুম। সমস্ত মনের ভিতরটা যেন ছুটি-পাওয়া স্কুলের ছেলের মতো বাইরে ঝাঁপিয়ে উঠেছিল। শেষকালে বৃষ্টির ছাঁটে যখন বেশ একটু আর্দ্র হয়ে ওঠা গেল তখন জানলা এবং কবিত্ব বন্ধ ক'রে খাঁচার পাখির মতো অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইলুম।

২৫

সাজাদপুর

জলপথে

২০ জুন ১৮৯১

কাল টেলিগ্রামের উত্তর পেয়ে আমাদের সমস্ত কাজ সেরে সন্ধের সময় নৌকো ছেড়ে দিলুম। আকাশে মেঘ ছিল না, চাঁদ উঠেছিল, অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল, ঝুপ্ ঝুপ্ দাঁড় ফেলে স্রোতের মুখে ছোটো নদীটির মধ্যে ভেসে যাওয়া যাচ্ছিল। চারিদিক পরীস্থান ব'লে মনে হচ্ছিল। সে সময়ে অন্যান্য সমস্ত নৌকো ডাঙায় কাছি বেঁধে পাল গুটিয়ে চন্দ্রালোকে স্তব্ধ হয়ে নিদ্রা দিচ্ছিল। অবশেষে ছোটো নদীটা যেখানে যমুনার মধ্যে গিয়ে পড়েছে তারই কাছে একটা খুব নিরাপদ স্থানে গিয়ে নৌকো বাঁধলে। কিন্তু নিরাপদ স্থানের অনেক দোষ ; হাওয়া পাওয়া যায় না— ঝুপ্সির ভিতরে, অন্যান্য নৌকোর কাছে, জঙ্গলের গন্ধ ইত্যাদি— আমি মাঝিকে বললুম, 'এ পারে হাওয়া পাওয়া যাবে না, ও পারে চল্।' ও পারে উঁচু পাড় নেই, জলে স্থলে সমান— এমন-কি ধানের খেতের উপর একহাঁটু জল উঠেছে। মাঝি সেইখানেই নৌকো নিয়ে বাঁধলে। তখন আমাদের পিছন দিকের আকাশে একটু বিদ্যুৎ চিক্মিক্ করতে আরম্ভ করেছে। আমি বিছানায় ঢুকে জানলার কাছে মুখ রেখে খেতের দিকে চেয়ে আছি এমন সময় রব উঠল— ঝড় আসছে। 'কাছি ফেল্, নোঙর ফেল্, এ কর্, সে কর্' করতে করতে এক প্রলয়-ঝড় ছুটে এল। মাঝি থেকে থেকে বলতে লাগল, 'ভয় কোরো না ভাই, আল্লার নাম করো, আল্লা মালেক।' থেকে থেকে সকলে 'আল্লা আল্লা' করতে লাগল। আমাদের বোটের দুই পাশের পর্দা বাতাসে আছাড় খেয়ে খেয়ে শব্দ করতে লাগল, আমাদের বোটটা যেন একটা শিকলি-

বাঁধা পাখির মতো পাখা ঝাপটে ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ করছিল— ঝড়টা থেকে থেকে চীঁহি চীঁহি শব্দ ক'রে একটা বিপর্যয় চিলের মতো হঠাৎ এসে প'ড়ে বোটের ঝুঁটি ধ'রে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়, বোটটা অমনি সশব্দে ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে ওঠে। অনেক ক্ষণ বাদে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে ঝড় থেমে গেল। আমি হাওয়া খেতে চেয়েছিলুম; হাওয়াটা কিছু বেশি খাইয়ে দিলে, একেবারে আশাতিরিক্ত। যেন কে ঠাট্টা ক'রে ব'লে যাচ্ছিল, 'এইবার পেট ভরে হাওয়া খেয়ে নাও, তার পরে সাধ মিটলে কিঞ্চিৎ জল খাওয়াব, তাতে এমনি পেট ভরবে যে ভবিষ্যতে আর কিছু খেতে হবে না।' আমরা কি না প্রকৃতির নাতি-সম্পর্ক, তাই তিনি মধ্যে মধ্যে এই রকম একটু-আধটু তামাশা ক'রে থাকেন। আমি তো পূর্বেই বলেছি, জীবনটা একটা গম্ভীর বিদ্রূপ, এর মজাটা বোঝা একটু শক্ত, কারণ, যাকে নিয়ে মজা করা হয় মজার রসটা সে তেমন গ্রহণ করতে পারে না। এই মনে করো, দুপুর রাত্রে খাটে শুয়ে আছি, হঠাৎ পৃথিবীটা ধরে এমনি নাড়া দিলে যে কে কোথায় পালাবে পথ পায় না। মতলবটা খুব নতুন রকমের এবং মজাটা খুব আকস্মিক তার আর সন্দেহ নেই— বড়ো বড়ো সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের অর্ধেক রাত্রে ঊর্ধ্বশ্বাসে অসম্বৃত অবস্থায় বিছানার বাইরে দৌড় করানো কি কম কৌতুক! এবং দুটো-একটা সদ্যোনিদ্রোত্থিত হতবুদ্ধি নিরীহ লোকের মাথার উপরে বাড়ির আস্ত ছাতটা ভেঙে আনা কি কম ঠাট্টা! হতভাগ্য লোকটা যেদিন ব্যাঙ্কে চেক্‌ লিখে রাজমিস্ত্রির বিল শোধ করছিল, রহস্যপ্রিয়া প্রকৃতি সেই দিন বসে বসে কত হেসেছিল।

সাজাদপুর
২২ জুন্ ১৮৯১

আজকাল আমার এখানে এমন চমৎকার জ্যোৎস্নারাত্রি হয় সে আর কী বলব। অবশ্য যে ঠিকানায় এ চিঠি গিয়ে পৌঁছবে সেখানেও যে জ্যোৎস্নারাত্রি হয় না, তা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। স্বীকার করতেই হবে, সেখানে সেই ময়দানের উপর, সেই গির্জের চূড়ার উপর, সম্মুখের নিস্তব্ধ গাছপালার উপর, ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না আপনার নীরব অধিকার বিস্তার করে, কিন্তু সেখানে জ্যোৎস্না ছাড়াও অন্য পাঁচটা বস্তু আছে— কিন্তু আমার এই নিস্তব্ধ রাত্রি ছাড়া আর কিছুই নেই। একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারি নে। এক দল আছে তারা ছুট্‌ফট্ করে 'জগতের সকল কথা জানতে পারছি নে কেন', আর-এক দল ছট্‌ফটিয়ে মরে 'মনের সকল ভাব প্রকাশ করতে পারছি নে কেন'— মাঝের থেকে জগতের কথা জগতেই থেকে যায় এবং অন্তরের কথা অন্তরেই থাকে। মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই, বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল্‌ছল্ শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্‌ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়'। অনেক সময় মনের আন্তরিক অভিমান একটু স্নেহের স্বর শুনলেই অমনি অশ্রুজলে ফেটে পড়ে; এই অপরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে প্রকৃতির উপর আমাদের যে আজন্মকালের অভিমান আছে, যখনই প্রকৃতি স্নেহমধুর হয়ে ওঠে তখনই সেই অভিমান অশ্রুজল হয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে— তখন প্রকৃতি আরো বেশি ক'রে আদর করে, এবং তার বুকের মধ্যে অধিকতর আবেগের সহিত মুখ লুকোই।

২৭

সাজাদপুর
২৩ জুন ১৮৯১

আজকাল দুপুর বেলাটা বেশ লাগে। রৌদ্রে চারি দিক বেশ নিঃঝুম হয়ে থাকে, মনটা ভারি উড়ু্উড়ু্ করে, বই হাতে নিয়ে আর পড়তে ইচ্ছে করে না। তীরে যেখানে নৌকো বাঁধা আছে সেইখান থেকে এক রকম ঘাসের গন্ধ এবং থেকে থেকে পৃথিবীর একটা গরম ভাপ গায়ের উপরে এসে লাগতে থাকে— মনে হয়, এই জীবন্ত উত্তপ্ত ধরণী আমার খুব নিকটে থেকে নিশ্বাস ফেলছে, বোধ করি আমারও নিশ্বাস তার গায়ে গিয়ে লাগছে। ছোটো ছোটো ধানের গাছগুলো বাতাসে ক্রমাগত কাঁপছে, পাতিহাঁস জলের মধ্যে নেমে ক্রমাগত মাথা ডুবোচ্ছে এবং চঞ্চু দিয়ে পিঠের পালক সাফ করছে। আর কোনো শব্দ নেই, কেবল জলের বেগে বোটটা যখন ধীরে ধীরে বেঁকতে থাকে তখন কাছিটা এবং বোটের সিঁড়িটা এক রকম করুণ মৃদু শব্দ করতে থাকে। অনতিদূরে একটা খেয়াঘাট আছে। বটগাছের তলায় নানাবিধ লোক জড়ো হয়ে নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করছে, নৌকো আসবামাত্রই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ছে— অনেক ক্ষণ ধরে এই নৌকো-পারাপার দেখতে বেশ লাগে। ও পারে হাট ; তাই খেয়া-নৌকোয় এত ভিড়। কেউ বা ঘাসের বোঝা, কেউ বা একটা চুপড়ি, কেউ বা একটা বস্তা কাঁধে ক'রে হাটে যাচ্ছে এবং হাট থেকে ফিরে আসছে— ছোটো নদীটি এবং দুই পারের দুই ছোটো গ্রামের মধ্যে নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় এই একটুখানি কাজকর্ম, মনুষ্যজীবনের এই একটুখানি স্রোত, অতি ধীরে ধীরে চলছে। আমি বসে বসে ভাবছিলুম, আমাদের দেশের মাঠ ঘাট আকাশ রোদ্দুরের মধ্যে এমন একটা সুগভীর বিষাদের

ভাব কেন লেগে আছে। তার কারণ এই মনে হল, আমাদের দেশে প্রকৃতিটা সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে— আকাশ মেঘমুক্ত, মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁঝাঁ করছে— এর মধ্যে মানুষকে অতি সামান্য মনে হয়; মানুষ আসছে এবং যাচ্ছে, এই খেয়ানৌকোর মতো পারাপার হচ্ছে, তাদের অল্প অল্প কলরব শোনা যায়, এই সংসারের হাটে ছোটোখাটো সুখদুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়; কিন্তু এই অনন্তপ্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদুগুঞ্জন, সেই একটু-আধটু গীতধ্বনি, সেই নিশিদিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী, কী নিষ্ফলকাতরতাপূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ নিশ্চিন্ত নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎ সৌন্দর্যপূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারই তুলনায় আপনার মধ্যে এমন একটা সততসচেষ্ট পীড়িত জর্জরিত ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যেতে হয়। 'ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান তরুমর্মর পবনে' ইত্যাদি। যেখানে মেঘে কুয়াশায় বরফে অন্ধকারে প্রকৃতি আচ্ছন্ন, সংকুচিত, সেখানে মানুষের খুব কর্তৃত্ব— মানুষ সেখানে আপনার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী মনে করে, আপনার সকল কাজকে চিহ্নিত করে রেখে দেয়, পস্টারিটির দিকে তাকায়, কীর্তিস্তম্ভ তৈরি করে, জীবনচরিত লেখে, এবং মৃতদেহের উপরেও পাষাণের চিরস্মরণগৃহ নির্মাণ করে; তার পরে অনেক চিহ্ন ভেঙে যায় এবং অনেক নাম বিস্মৃত হয়, কিন্তু সময়াভাবে সেটা কারও খেয়ালে আসে না।

সাজাদপুর

বিকেল বেলায় আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপরে বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলে মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেআদবি মনে করে; মাঝিরা যদি আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাসি-গল্প করে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে; চাষারা যদি ঘাটে গোরুকে জল খাওয়াতে নিয়ে আসে তারা তৎক্ষণাৎ লাঠি হাতে করে রাজমর্যাদা রক্ষা করতে ধাবিত হয়। অর্থাৎ রাজার চতুর্দিকটা হাসিহীন খেলাহীন শব্দহীন জনহীন ভীষণ মরুভূমি করতে পারলে তাদের মনের মতো রাজসম্ভ্রম রক্ষা হয়। কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম। ঘটনাটা হচ্ছে এই—

ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকোর মাস্তুল পড়ে ছিল— গোটাকতক বিবস্ত্র খুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব-সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তা হলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ, 'সাবাস জোয়ান— হেঁইয়ো! মারো ঠেলা— হেঁইয়ো!' মাস্তুল যেমনি এক পাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য। কিন্তু এই ছেলেদের মধ্যে যে দুটি-একটি মেয়ে আছে, তাদের ভাব আর-এক রকম। সঙ্গী-অভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু এই-সকল শ্রমসাধ্য উৎকট খেলায় তাদের মনের যোগ নেই। একটি ছোটো মেয়ে বিনা

বাক্যব্যয়ে গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দুই-একজন ভাবলে, এমন স্থলে হার মানাই ভালো ; তফাতে গিয়ে তারা ম্লানমুখে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাচ্ছলে মেয়েটাকে একটু একটু ঠেলতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করতে লাগল। সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তাকে বিশ্রামের জন্যে অন্য স্থান নির্দেশ ক'রে দিলে, সে তাতে সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়েচড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বসল। তখন সেই ছেলেটা শারীরিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলম্বে কৃতকার্য হল। আবার অভ্রভেদী আনন্দধ্বনি উঠল, পুনর্বার মাস্তুল গড়াতে লাগল — এমন-কি, খানিক ক্ষণ বাদে মেয়েটাও তার নারীগৌরব এবং সুমহৎ নিশ্চেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ছেলেদের এই অর্থহীন চপলতায় যোগ দিলে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল, সে মনে মনে বলছিল— ছেলেরা খেলা করতে জানে না, কেবল যত রাজ্যের ছেলেমানুষি। হাতের কাছে যদি একটা খোঁপাওয়ালা হলদে রঙের মাটির বেনে-পুতুল থাকত তা হলে কি সে আর এই অপরিণতবুদ্ধি নিতান্ত শিশুদের সঙ্গে মাস্তুল ঠেলার মতো এমন একটা বাজে খেলায় যোগ দিত! এমনসময় আর-এক রকমের খেলা তাদের মনে এল, সেটাও খুব মজার। দুজন ছেলেতে মিলে একটা ছেলের হাত পা ধরে ঝুলিয়ে তাকে দোলা দেবে। এর ভিতরে খুব একটা রহস্য আছে সন্দেহ নেই, কারণ ছেলেরা বেজায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু মেয়েটার পক্ষে অসহ্য হল। সে অবজ্ঞাভরে ক্রীড়াক্ষেত্র ত্যাগ করে ঘরে চলে গেল। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটল। যাকে দোলাচ্ছিল সে গেল পড়ে। সেই অভিমানে সে সঙ্গীদের ত্যাগ করে

বহু দূরে গিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে তৃণশয্যায় শুয়ে পড়ল; ভাবে এই রকম জানালে— এই পাষাণহৃদয় জগৎসংসারের সঙ্গে সে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না, কেবল একলা চীত হয়ে শুয়ে আকাশের তারা গণনা করবে, মেঘের খেলা দেখে হাতে মাথা রেখে জীবন কাটিয়ে দেবে এবং 'যাবত জীবন রবে কারও সঙ্গে খেলিব না'। তার এইরকম অকালে পরম বৈরাগ্য দেখে বড়ো ছেলেটা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে কোলের উপর তার মাথাটা নিয়ে সানুনয় স্বরে অনুতাপ প্রকাশ করে বলতে লাগল, 'আয়-না ভাই, ওঠ্-না ভাই, লেগেছে ভাই!' অনতিকাল পরেই দুই কুকুরশাবকের মতো দুজনের হাত-কাড়াকাড়ি খেলা বেধে গেল— এবং দু মিনিট না যেতে যেতে দেখি সেই ছেলে ফের দুলতে আরম্ভ করেছে। এমনি মানুষের প্রতিজ্ঞা! এমনি তার মনের বল! এমনি তার বুদ্ধির স্থিরতা! খেলা ছেড়ে একবার দূরে গিয়ে চীত হয়ে শোয়, আবার ধরা দিয়ে হেসে হেসে মোহদোলায় দুলতে থাকে। এ মানুষের মুক্তি কী ক'রে হবে! এমন কজন ছেলে আছে যে খেলাঘর ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে কেবল চীত হয়ে পড়ে থাকে— সেই-সব ভালো ছেলেদের জন্যে গোলকধামে বাসা তৈরি হচ্ছে।

সাজাদপুর
জুন ১৮৯১

কাল রাত্রে ভারি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলুম। সমস্ত কলকাতা শহরটা যেন মহা একটা ভীষণ অথচ আশ্চর্য ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে— বাড়িঘর সমস্তই একটা অন্ধকার কালো কুয়াশার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে, এবং তার ভিতর তুমুল কী-একটা কাণ্ড চলছে। আমি একটা ভাড়াটে গাড়ি ক'রে পার্ক্ স্ট্রীটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। যেতে যেতে দেখলুম, সেণ্ট্-জেভিয়ার কলেজটা দেখতে দেখতে হুহু ক'রে বেড়ে উঠছে, সেই অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে অসম্ভব উঁচু হয়ে উঠছে। তার পরে ক্রমে জানতে পারলুম, এক দল অদ্ভুত লোক এসেছে, তারা টাকা পেলে কী-এক কৌশলে এইরকম অপূর্ব ব্যপার করতে পারে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি এসে দেখি সেখানেও তারা এসেছে; বদ দেখতে, কতকটা মোঙ্গোলিয়ান ধাঁচের চেহারা— সরু গোঁপ, গোটা দশ-বারো দাড়ি মুখের এ দিকে ও দিকে খোঁচাখোঁচা-রকম বেরিয়েছে। তারা মানুষকেও বড়ো করে দিতে পারে। তাই আমাদের দেউড়িতে আমাদের বাড়ির সব মেয়েরা লম্বা হবার জন্যে উমেদার হয়েছেন; তারা এঁদের মাথায় কী-একটা গুঁড়ো দিচ্ছে আর এঁরা হুস ক'রে লম্বা হয়ে উঠছেন। আমি কেবলই বলছি, 'কী আশ্চর্য, এ যেন ঠিক স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।' তার পরে কে একজন প্রস্তাব করলে, আমাদের বাড়িটা উঁচু ক'রে দিতে। তারা রাজি হয়ে বাড়ি কতকটা ভাঙতে আরম্ভ করলে, খানিকটা ভেঙেচুরে বললে, 'এইবার এত টাকা চাই, নইলে বাড়িতে হাত দেব না।' কুঞ্জসরকার বললে, 'সে কী হয়! কাজ না হয়ে গেলে কী ক'রে টাকা দেওয়া যায়!' বলতেই তারা চটে

উঠল— বাড়িটা সমস্তই একরকম বেঁকেচুরে বিশ্রী হয়ে গেল এবং মাঝে মাঝে দেখা গেল, আধখানা মানুষ দেয়ালের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, আধখানা বেরিয়ে। সমস্ত দেখে শুনে মনে হল, এ-সব শয়তানি কাণ্ড। বড়দাদাকে বললুম, 'বড়দা, দেখছেন ব্যাপারটা! আসুন একবার উপাসনা করা যাক।' দালানে গিয়ে খুব একাগ্র-মনে উপাসনা করা গেল। বেরিয়ে এসে মনে করলুম, ঈশ্বরের নাম ক'রে তাদের ভর্ৎসনা করব— কিন্তু বুক ফেটে যেতে লাগল, তবু গলা দিয়ে কথা বেরোল না। তার পর কখন জেগে উঠলুম ঠিক মনে পড়ছে না। ভারি অদ্ভুত স্বপ্ন। না? সমস্ত কলকাতা শহরে শয়তানের প্রাদুর্ভাব— সবাই তার সাহায্যে বেড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, একটা অন্ধকার নারকী কুজ্ঝটিকার মধ্যে সমস্ত শহরের ভয়ংকর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু ওর মধ্যে একটু পরিহাসও ছিল— এত দেশ থাকতে জেসুয়িট্‌দের ইস্কুলটার উপরেই শয়তানের এত অনুগ্রহ কেন!

...

তার পরে এখানকার স্কুলের মাস্টারেরা দর্শনাভিলাষী হয়ে এসে উপস্থিত। তাঁরা কিছুতেই উঠতে চান না, অথচ আমার আবার তেমন কথা জোগায় না— পাঁচ মিনিট অন্তর দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করি। তার এক-আধটা উত্তর পাই, তার পরে বোকার মতো বসে থাকি, কলম নাড়ি, মাথা চুলকোই। জিজ্ঞাসা করি, এবার এখানে শস্য কি রকম হয়েছে। স্কুল-মাস্টাররা শস্য সম্বন্ধে কিছুই জানেন না; ছাত্র সম্বন্ধে যা-কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তা আরম্ভেই হয়ে গেছে। ফের আবার গোড়ার কথা পাড়লুম, জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনাদের স্কুলে কজন ছাত্র।' একজন বললেন, আশি জন; আর-একজন বললেন, না, এক শো পঁচাত্তর জন। মনে করলুম, দুজনের

মধ্যে খুব একটা তর্ক বেধে যাবে ; কিন্তু দেখলুম, তৎক্ষণাৎ মতের ঐক্য হয়ে গেল। তার পরে দেড় ঘণ্টা পরে কেন যে তাঁদের মনে পড়ল 'আজ তবে আসি', তা ঠিক বোঝা শক্ত— আর এক ঘণ্টা পূর্বেও মনে হতে পারত, আর বারো ঘণ্টা পরেও মনে হতে পারত। দেখা যাচ্ছে, এর ভিতরে কোনো-একটা নিয়ম নেই, অন্ধ দৈবঘটনা মাত্র।

সাজাদপুর
৪ জুলাই ১৮৯১

আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি 'জনপদবধূ' তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় একজন কে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগুলি কচি ছেলে, অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেক-গুলি পাকা চুল একত্র হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়সে বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দো-পনেরো দেখাচ্ছে। মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। একটা ছেলে কোলে ক'রে এমন নিঃসংকোচ কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তার মুখখানিতে কিছু যেন নির্বুদ্ধিতা কিম্বা অসরলতা কিম্বা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষতঃ আধা ছেলে আধা মেয়ের মতো হয়ে আরও একটু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মতো আত্ম-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারি নতুন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে যে এরকম ছাঁদের 'জনপদবধূ' দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করি নি। দেখছি এদের বংশটাই তেমন বেশি লাজুক নয়। একজন মেয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রে চুল এলিয়ে দশাঙ্গুলি দ্বারা জটা ছাড়াচ্ছে এবং নৌকোর আর-একটি রমণীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ঘরকন্নার আলাপ হচ্ছে। শোনা গেল, তার একটি মাত্র 'ম্যায়া', অন্য 'ছাওয়াল নাই' — কিন্তু সে মেয়েটির বুদ্ধিসুদ্ধি নেই— 'কারে কী কয়, কারে কী

হয়, আপন পর জ্ঞান নেই'। আরও অবগত হওয়া গেল, গোপাল সা'র জামাইটি তেমন ভালো হয় নি, মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না। অবশেষে যখন যাত্রার সময় হল তখন দেখলুম, আমার সেই চুল-ছাঁটা, গোলগাল হাতে বালা পরা, উজ্জ্বল-সরল-মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকোয় তুললে। বুঝলুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে। নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই-একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ মুছতে লাগল। একটি ছোটো মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল সে বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুলখেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে সে একে টিপিয়েও দিত। সকাল বেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগল। সকাল বেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মতো। মনে হল, সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ। এই অজ্ঞাত ছোটো মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল। বিদায়কালে এই নৌকো করে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে যেন আরও একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মতো— তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া ; যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু, যারা রইল এবং গেল উভয়েই ভুলে যাবে, হয়তো এত ক্ষণে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চির-স্থায়ী, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্য, বিস্মৃতি সত্যি নয়। এক-একটা বিচ্ছেদ এবং এক-একটা মৃত্যুর সময়

মানুষ সহসা জানতে পারে এই ব্যথাটা কী ভয়ংকর সত্য। জানতে পারে যে, মানুষ কেবল ভ্রমক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে। কেউ থাকে না— এবং সেইটে মনে করলে মানুষ আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কেবল যে থাকব না তা নয়, কারও মনেও থাকব না!... বাস্তবিক, আমাদের দেশের করুণ রাগিণী ছাড়া সমস্ত মানুষের পক্ষে, চিরকালের মানুষের পক্ষে আর কোনো গান সম্ভবে না।

কটকাভিমুখ জলপথে

অগস্ট ১৮৯১

পরিধেয় বস্ত্র প্রতিদিন মলিন এবং অসহ্য হয়ে আসছে অথচ কাপড়ের ব্যাগটি নেই, এ কথা চিত্তের মধ্যে অহর্নিশি জগরূক থাকলে ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম দূর হয়ে যায়। সেই ব্যাগটা থাকলে যেরকম উন্নতমস্তকে সতেজে জনসমাজে বিচরণ করতে পারতুম, এখন আর তা পারছি নে। কোনোমতে নিজেকে প্রচ্ছন্ন এবং সাধারণের দৃষ্টি-অন্তরালে রাখতে ইচ্ছে করছে। এই কাপড় পরেই রাত্রে শয়ন করছি এবং প্রাতঃকালে প্রকাশিত হচ্ছি। স্টিমারে আবার সর্বত্রই কয়লার গুঁড়ো এবং মলিনতা, মধ্যাহ্নের অসহ্য উত্তাপে সর্বশরীর বাষ্পাকুল হয়ে উঠছে। তা ছাড়া স্টিমারে যে সুখে আছি সে কথা লিখে আর কী করব। কত রকমের যে সঙ্গী জুটেছে তার আর সংখ্যা নেই। অঘোরবাবু ব'লে একটি কে এসেছে, সে পৃথিবীর সমস্ত জড় এবং চেতন পদার্থকে মামাশ্বশুরের ভাগ্‌নে ব'লে উল্লেখ করছে। আর-একটি সংগীতকুশল লোক অর্ধেক রাত্রে ভৈঁরো আলাপ করতে লাগল। বিবিধ কারণে সেটা নিতান্ত অসাময়িক ব'লে বোধ হতে লাগল। একটা সুঁড়ি খালের মধ্যে জাহাজ আটকে কাল বিকেল থেকে আজ ন'টা পর্যন্ত যাপন করা গেছে। সমস্ত যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে ডেকের এক ধারে নির্জীব এবং বিমর্ষ ভাবে শুয়ে ছিলুম। খান্‌সামাজিকে বলেছিলুম রাতে লুচি করতে; সে কতকগুলি আকারপ্রকারহীন ভাজা ময়দা তৈরি করে এনেছিল, তার সঙ্গে ছোকা কিম্বা ভাজাভুজির উপলক্ষ্য মাত্র ছিল না। দেখে আমি কিঞ্চিৎ বিস্ময় এবং আক্ষেপ প্রকাশ করলুম। সে ব্যক্তি তটস্থ হয়ে বললে, 'হম্‌ আবি বনা দেতা।' রাত্রের আধিক্য দেখে আমি তাতে অসম্মত হয়ে যথাসাধ্য শুষ্ক

লুচি খেয়ে আলো এবং লোকজনের মধ্যে শুয়ে পড়লুম— শূন্যে মশা এবং চতুষ্পার্শ্বে আরসোলা সঞ্চরণ করছে ; ঠিক পায়ের কাছেই আর-এক ব্যক্তি শয়ন করেছে, তার গায়ে মাঝে মাঝে আমার পা ঠেকছে ; চারটে-পাঁচটা নাক অবিশ্রাম ডাকছে, মশকদষ্ট বীতনিদ্র হতভাগ্যগণ তামাক টানছে— এবং এরই মধ্যে ভৈঁরো রাগিণী। রাত যখন সাড়ে তিনটে তখন কতকগুলি ব্যস্তবাগীশ লোক পরস্পরকে জাগ্রত হতে উৎসাহিত করতে লাগল। আমি নিতান্ত কাতর ভাবে শয্যা ত্যাগ করে আমার চৌকিটাতে ঠেস দিয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষায় বসে রইলুম। একটা বিচিত্র অভিশাপের মতো রাতটা কেটে গেল। একটা খালাসির কাছে সংবাদ পেলুম, স্টিমার এমনি আটকে গেছে আজ সমস্ত দিন নড়বে না। একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলুম, কলকাতা-মুখী কি কোনো জাহাজ ইতিমধ্যে পাওয়া যাবে। সে হেসে বললে, এই জাহাজই গম্যস্থানে পৌঁছে পুনশ্চ কলকাতায় ফিরবে, অতএব ইচ্ছে করলে এই জাহাজে করেই ফিরতে পারি। সৌভাগ্যক্রমে অনেক টানাটানির পর প্রায় দশটার কাছাকাছি জাহাজ চলতে আরম্ভ করলে।

চাঁদনি চক। কটক
৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

—বাবু খুব মোটাসোটা বর্ধিষ্ণু চেহারার লোক, তাঁর ভাবখানা খুব একজন লম্বাচৌড়া কৃষ্ণবিষ্ণুর মতো। বয়স যথেষ্ট হয়েছে—একখানি কোঁচানো চাদর কাঁধে, ফিট্‌ফাট্ সাজ, গায়ে এসেন্সের গন্ধ, দু-থাক চিবুক, প্রমাণসই গোঁফ, কপাল গড়ানে, বড়ো বড়ো ড্যাবা চোখ আত্মম্ভরিতায় অর্ধনিমীলিত, কথা কবার সময় চোখের তারা আকাশের দিকে ওঠে, জলদগম্ভীর স্বরে অতি মৃদুমন্দ সুস্থ সহাস্য ভাবে কথা কন— সময় যেন অনুগত ভৃত্যের মতো তাঁর অবসর-অপেক্ষায় এক পাশে স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে— কোনো বিষয়ে তিলমাত্র তাড়া নেই। চোখ দুটো উল্টে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'জ্যোতি এখন কোথায় আছে?' প্রশ্নকর্তার অবিচলিত গাম্ভীর্যে আমার অন্তঃকরণ সসম্ভ্রমে শশব্যস্ত হয়ে উঠল, আমি মৃদু বিনীত ভাবে আমার দাদার রাজধানীতে অবস্থান জ্ঞাপন করলুম। তিনি বললেন, 'বীরেন্দ্রের সঙ্গে আমি একসঙ্গে পড়েছি।' শুনে আমার চিত্ত আরও অভিভূত হয়ে পড়ল। এর উপরে যখন তিনি, কারও পরামর্শের অপেক্ষা না রেখে অকস্মাৎ অসময়ে এখানে আসা সম্বন্ধে আমার বালকোচিত অবিবেচনার উল্লেখ করলেন, তখন আমি কিরকম ম্লান অপ্রতিভ হয়ে গেলুম সে অনুমান করা শক্ত হবে না। আমি কেবলই নতমুখে বারবার বলতে লাগলুম, 'আমি প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানতুম না, আর-কখনো আসি নি, এই প্রথম আসছি।' তার থেকে তর্ক উঠল, 'জ্যোতি কখন্ এসেছিল?' সময়-নির্ণয় সম্বন্ধে বরদার সঙ্গে তাঁর ঘোর অনৈক্য হল।

তিনি ৭৪।৭৫ বলেন, বরদা বলেন তার পূর্বে। এর থেকেই বুঝতে পারা যাবে, ইতিহাস লেখা কত শক্ত। তাই মনে করছি, এইবার থেকে আমার চিঠিতে তারিখ দিতে হবে।

৩৩

তিরন
৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

বালিয়ার ঘাটটি বেশ দেখতে। দুই ধারে বেশ বড়ো বড়ো গাছ; সবসুদ্ধ খালটা দেখে সেই পুনার ছোটো নদীটি মনে পড়ে।

আমি ভালো করে ভেবে দেখলুম, এই খালটাকে যদি নদী ব'লে জানতুম তা হলে ঢের বেশি ভালো লাগত। দুই তীরে বড়ো নারকেল গাছ, আম গাছ এবং নানাজাতীয় ছায়াতরু; ঢালু পরিষ্কার তট সুন্দর সবুজ ঘাস এবং অসংখ্য পুষ্পিত লজ্জাবতী লতায় আচ্ছন্ন, কোথাও বা কেয়াবন। যেখানে গাছগুলি একটু বিরল সেইখান থেকে দেখা যায়, খালের উঁচু পাড়ের নীচে একটা অপার মাঠ ধূ ধূ করছে, বর্ষাকালে শস্যক্ষেত্র এমনি গাঢ় সবুজ হয়েছে যে দুটি চোখ যেন একেবারে ডুবে যায়— মাঝে মাঝে খেজুর এবং নারকেল গাছের মণ্ডলীর মধ্যে ছোটো ছোটো গ্রাম— এই-সমস্ত দৃশ্য বর্ষাকালের স্নিগ্ধ মেঘাচ্ছন্ন আনত আকাশের নীচে শ্যামচ্ছায়াময় হয়ে আছে। খালটি তার দুই পরিষ্কার সবুজ শষ্পতটের মাঝখান দিয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে বেঁকে বেঁকে চলে গেছে। মৃদু মৃদু স্রোত; যেখানে খুব সংকীর্ণ হয়ে এসেছে সেখানে জলের কিনারার কাছে কাছে কুমুদবন এবং বড়ো বড়ো ঘাস দেখা দিয়েছে। কিন্তু তবু মনের মধ্যে একটা আক্ষেপ থেকে যায়, এটা একটা কাটা খাল বৈ নয়— এর জলকলধ্বনির মধ্যে অনাদি প্রাচীনত্ব নেই, এ কোনো দূর দুর্গম জনহীন পর্বতগুহার রহস্য জানে না, কোনো-একটি প্রাচীন স্ত্রী-নাম ধারণ ক'রে অতি অজ্ঞাতকাল থেকে দুই তীরের গ্রামগুলিকে স্তন্যদান ক'রে আসে নি, এ কখনো কুলুকুলু ক'রে বলতে পারে না—

মেন মে কাম অ্যাণ্ড্ মেন মে গো,
বাট আই গো-অন ফর এভার।

প্রাচীনকালের বড়ো বড়ো দিঘিও এর চেয়ে ঢের বেশি গৌরবলাভ করেছে। এর থেকেই বেশ বোঝা যায়, একটা প্রাচীন বড়ো বংশ অনেক বিষয়ে হীন হলেও কেন এত সমাদর লাভ করে। তাদের উপরে যেন বহুকালের একটা সম্পদশ্রীর আভা থাকে। একজন সোনার ব্যাপারী হঠাৎ বড়োমানুষ হয়ে উঠলে অনেক সোনা পায়, কিন্তু সেই সোনার লাবণ্যটুকু শীঘ্র পায় না। যা হোক, আর এক শো বৎসর পরে যখন এই তীরের গাছগুলো আরও অনেক বড়ো হয়ে উঠবে, তক্‌তকে সাদা মাইল্‌স্টোনগুলো অনেকটা ক্ষয়ে গিয়ে শৈবালাচ্ছন্ন ম্লান হয়ে আসবে, লকের উপরে খোদিত 1871 তারিখ যখন অনেক দূরবর্তী ব'লে মনে হবে, তখন যদি আমি আমার প্রপৌত্র-জন্ম লাভ করে এই খালের মধ্যে বোট নিয়ে আমাদের পাণ্ডুয়া জমিদারি তদন্ত করতে যেতে পারি তখন আমার মনের মধ্যে অনেকটা ভিন্নরকম ভাবোদয় হতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু, হায় আমার প্রপৌত্র! তার ভাগ্যে কী আছে কে জানে। হয়তো একটা অজ্ঞাত অখ্যাত কেরানিগিরি। ঠাকুরবংশের একটা ছিন্ন টুকরো, বহু দূরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে একটা মৃত উল্কাখণ্ডের মতো হয়তো জ্যোতির্হীন নির্বাপিত। কিন্তু আমার উপস্থিত দুর্দশা এত আছে যে আমার প্রপৌত্রের জন্যে বিলাপ করবার কোনো দরকার নেই।

চারটের সময় তারপুরে পৌঁছনো গেল। এইখানে আমাদের পাল্‌কি-যাত্রা আরম্ভ হল। মনে করলুম, ছ ক্রোশ পথ, সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই আমাদের কুঠিতে পৌঁছতে পারব। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, মাইলের পর মাইল কেটে যাচ্ছে, ছ ক্রোশ পথ আর ফুরোয় না। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় বেহারাদের জিজ্ঞাসা

করলুম, আর কত দূর। তারা বললে, আর বেশি নেই, তিন ক্রোশের কিছু উপর বাকি আছে। শুনে পাল্‌কির মধ্যে একটু নড়েচড়ে বসলুম। পাল্‌কিতে আমার আধখানা বৈ ধরে না; কোমর টন্‌ টন্‌ করছে, পা ঝিন্‌ ঝিন্‌ করছে, মাথা ঠক্‌ ঠক্‌ করছে — যদি নিজেকে তিন-চার ভাঁজ ক'রে মুড়ে রাখবার কোনো উপায় থাকত তা হলেই এই পাল্‌কিতে কিছু সুবিধে হতে পারত। রাস্তা অতি ভয়ানক। সর্বত্রই এক-হাঁটু কাদা; এক-এক জায়গায় পিছলের ভয়ে বেহারারা অতি সাবধানে এক-এক পা ক'রে পা ফেলছে— তিন-চারবার তাদের পা হড়কে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি সামলে নিলে। মাঝে মাঝে রাস্তা নেই, ধানের খেতে অনেকখানি ক'রে জল দাঁড়িয়েছে, তারই উপর দিয়ে ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ ক'রে এগোচ্ছি। মেঘে রাত খুব অন্ধকার হয়ে এসেছে, টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে, তৈলাভাবে মশালটা মাঝে মাঝে নিবে যাচ্ছে, আবার অনেক ফুঁ দিয়ে দিয়ে জ্বালাতে হচ্ছে, বেহারারা সেই আলোকের অভাব নিয়ে ভারি বকাবকি বাধিয়ে দিয়েছে। এমনি করে খানিক দূরে এলে পর বরকন্দাজ জোড়হাতে নিবেদন করলে, একটা নদী এসেছে, এইখানে পাল্‌কি নৌকো করে পার করতে হবে, কিন্তু এখনো নৌকো এসে পৌঁছয় নি, অবিলম্বে এল ব'লে, অতএব খানিক ক্ষণ এইখানে পাল্‌কি রাখতে হবে। পাল্‌কি রাখলে। তার পরে নৌকো আর কিছুতে এসে পৌঁছোয় না। আস্তে আস্তে মশালটা নিবে গেল। সেই অন্ধকার নদীতীরে বরকন্দাজগুলো ভাঙা গলায় ঊর্ধ্বশ্বাসে নৌকোওয়ালাকে ডাকতে লাগল; নদীর পরপার থেকে তার প্রতিধ্বনি ফিরে আসতে লাগল, কিন্তু কোনো নৌকোওয়ালা সাড়া দিলে না। 'মুকুন্দো—ও-ও-ও', 'বালকৃষ্ণ—অ-অ-অ', 'নীলকণ্ঠ—অ-অ-অ'— এমন কাতর স্বরে আহ্বান করলে গোলকধাম

থেকে মুকুন্দ এবং কৈলাসশিখর থেকে নীলকণ্ঠ নেমে আসতেন, কিন্তু কর্ণধার কর্ণ রোধ করে অবিচলিত ভাবে নিজ নিকেতনে বিশ্রাম করতে লাগল। নির্জন নদীতীরে একটি কুঁড়েঘর মাত্রও নেই; কেবল পথপার্শ্বে চালকহীন বাহনহীন একটি শূন্য গোরুর গাড়ি পড়ে রয়েছে— আমাদের বেহারাগুলো তারই উপর চেপে বসে বিজাতীয় ভাষায় কলরব করতে লাগল। মক্ মক্ শব্দে ব্যাঙ ডাকছে এবং ঝিঁঝির ডাকে সমস্ত রাত্রি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমি মনে করলুম, এইখানেই পাল্‌কির মধ্যে বেঁকেচুরে হুম্‌ড়ে আজ রাতটা কাটাতে হবে, মুকুন্দ এবং নীলকণ্ঠ বোধ হয় কাল প্রভাতে এসে উপস্থিত হতেও পারে। মনে মনে গাইতে লাগলুম— ওগো,

ওগো, যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে-ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কী!

যাই হোক-না কেন, যদি কয় তো উড়ে ভাষায় কবে, আমি কিছুই বুঝতে পারব না; কিন্তু মুখে যে আমার হাসি থাকবে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক ক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। এমন সময় হুঁই-হাঁই হুঁই-হাঁই শব্দে বরদার পাল্‌কি এসে উপস্থিত হল। বরদা নৌকো আসবার সম্ভাবনা না দেখে হুকুম দিলেন পাল্‌কি মাথায় করে নদী পার করতে হবে। শুনে বেহারারা অনেক ইতস্তত করতে লাগল এবং আমার মনেও দয়া এবং কিঞ্চিৎ দ্বিধা উপস্থিত হতে লাগল। যা হোক, অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর তারা হরিনাম উচ্চারণ করতে করতে পাল্‌কি মাথায় করে নদীর মধ্যে নাবলে। বহু কষ্টে নদী পার হল। তখন রাত সাড়ে দশটা। আমি কোনো-রকম গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লুম। বেশ খানিকটা নিদ্রাকর্ষণ

হয়েছে এমন সময়ে হঠাৎ একটা বেহারার পা পিছলে গিয়ে পাল্‌কিটা খুব একটা নাড়া পেলে ; অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে বুকের ভিতর ভারি ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তার পর থেকে অর্ধ ঘুম অর্ধ জাগরণে রাত্তির দুপুরের সময় আমাদের পাণ্ডুয়া কুঠিতে এসে উত্তীর্ণ হলুম।

তিরন

৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

অনেক দিন পরে কাল মেঘবৃষ্টি কেটে শরতের সোনার রোদ্‌দুর উঠেছিল। পৃথিবীতে যে রোদ্‌দুর আছে সে কথা যেন একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম; হঠাৎ যখন কাল দশটা-এগারোটার পর রোদ্‌দুর ভেঙে পড়ল তখন যেন একটা নতুন জিনিস দেখে মনে অপূর্ব বিস্ময়ের উদয় হল। দিনটি বড়ো চমৎকার হয়েছিল। আমি দুপুর বেলায় স্নানাহারের পর বারান্দার সামনে একটি আরাম-কেদারার উপরে পা ছড়িয়ে দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় জাগ্রৎস্বপ্নে নিযুক্ত ছিলুম। আমার চোখের সামনে আমাদের বাড়ির কম্পাউণ্ডের কতকগুলি নারকেল গাছ— তার ও দিকে যত দূর দৃষ্টি যায় কেবলই শস্যক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্রের একেবারে প্রান্তভাগে গাছ-পালার একটুখানি ঝাপসা নীল আভাস মাত্র। ঘুঘু ডাকছে এবং মাঝে মাঝে গোরুর গলার নূপুর শোনা যাচ্ছে। কাঠবিড়ালি একবার লেজের উপর ভর দিয়ে বসে মাথা তুলে চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছে। খুব একটা নিঃঝুম নিঃস্তব্ধ নিরালা ভাব। বাতাস অবাধে হু হু করে বয়ে আসছে, নারকেল গাছের পাতা ঝর্ ঝর্ শব্দ করে কাঁপছে। দু-চারজন চাষা মাঠের এক জায়গায় জটলা করে ধানের ছোটো ছোটো চারা উপড়ে নিয়ে আঁটি করে করে বাঁধছে। কাজকর্মের মধ্যে এইটুকু কেবল দেখা যাচ্ছে।

শিলাইদহ
১ অক্টোবর ১৮৯১

বেলায় উঠে দেখলুম, চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল্ তল্ থৈ থৈ করছে। নদীর জল এবং তীর প্রায় সমতল, ধানের খেত সুন্দর সবুজ এবং গ্রামের গাছপালাগুলি বর্ষাবসানে সতেজ এবং নিবিড় হয়ে উঠেছে। এমন সুন্দর লাগল সে আর কী বলব। দুপুর বেলা খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তার পরে বিকেলে পদ্মার ধারে আমাদের নারকেল-বনের মধ্যে সূর্যাস্ত হল। আমি নদীর ধারে উঠে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম। আমার সামনের দিকে দূরে আমবাগানে সন্ধ্যার ছায়া পড়ে আসছে এবং আমার ফেরবার মুখে নারকেল গাছগুলির পিছনে আকাশ সোনায় সোনালি হয়ে উঠেছে। পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না। যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে, এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী-একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি। কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি, কেবল মৌলবিটা পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম বক্ বক্ করে আমাকে ব্যথিত করে তোলে।

শিলাইদহ

অক্টোবর ১৮৯১

আজ দিনটি বেশ হয়েছে। ঘাটে দুটি-একটি ক'রে নৌকো লাগছে, বিদেশ থেকে প্রবাসীরা পুজোর ছুটিতে পোঁটলা-পুঁটলি বাক্স-ধামা বোঝাই করে নানা উপহারসামগ্রী নিয়ে সম্বৎসর পরে বাড়ি ফিরে আসছে। দেখলুম, একটি বাবু ঘাটের কাছাকাছি নৌকো আসতেই পুরোনো কাপড় বদলে একটি নতুন কোঁচানো ধুতি পরলে; জামার উপর সাদা রেশমের একখানি চায়নাকোট গায়ে দিলে, আর একখানি পাকানো চাদর বহু যত্নে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে, ছাতা ঘাড়ে করে গ্রামের অভিমুখে চলল। ধানের খেত থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে, আকাশে সাদা সাদা মেঘের স্তূপ, তারই উপর আম এবং নারকেল গাছের মাথা উঠেছে, নারকেলের পাতা বাতাসে ঝুর্‌ঝুর্‌ করছে, চরের উপর দুটো-একটা করে কাশ ফুটে ওঠবার উপক্রম করেছে— সবসুদ্ধ বেশ একটা সুখের দৃশ্য। বিদেশ থেকে যে লোকটি এইমাত্র গ্রামে ফিরে এল, তার মনের ভাব, তার ঘরের লোকদের মিলনের আগ্রহ, এবং শরৎকালের এই আকাশ, এই পৃথিবী, সকাল বেলাকার এই ঝির্‌ঝিরে বাতাস— এবং গাছপালা, তৃণগুল্ম, নদীর তরঙ্গ, সকলের ভিতরকার একটি অবিশ্রাম সঘন কম্পন, সমস্ত মিশিয়ে বাতায়নবর্তী এই একক যুবকটিকে সুখে দুঃখে একরকম অভিভূত ক'রে ফেলছিল। পৃথিবীতে জানলার ধারে একলা বসে চোখ মেলে দেখলেই মনে নতুন সাধ জন্মায়— নতুন সাধ ঠিক নয়, পুরোনো সাধ নানা নতুন মূর্তি ধারণ করতে আরম্ভ করে। পর্‌শুদিন অমনি বোটের জানলার কাছে চুপ ক'রে বসে আছি, একটা জেলেডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতে গাইতে চলে গেল, খুব যে সুস্বর তা নয়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল,

বহুকাল হল ছেলেবেলায় বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম, একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে— গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনও শুনি নি। হঠাৎ মনে হল, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেই দিন থেকে ফিরে পাই! আর-একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়; এবার তাকে আর শুষ্ক অপরিতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিই নে— কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপ্‌ছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে; আপনাকেও একবার জানান দিই, অন্যকেও একবার জানি; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হু হু ক'রে বেড়িয়ে আসি, তার পরে ঘরে ফিরে এসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্ধক্যটা কবির মতো কাটাই। খুব যে একটা উঁচু আইডিয়াল তা নয়। জগতের হিত করা এর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো আইডিয়াল হতে পারে, কিন্তু আমি সবসুদ্ধ যেরকম লোক আমার ওটা মনেও উদয় হয় না। উপবাস ক'রে, আকাশের দিকে তাকিয়ে অনিদ্র থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক ক'রে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্য-হৃদয়কে কথায় কথায় বঞ্চিত ক'রে, স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাই নে। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ, তা না মনে ক'রে একে বিশ্বাস ক'রে ভালোবেসে, ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট— দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।

৩৭

শিলাইদহ
২৯ আশ্বিন
অক্টোবর ১৮৯১

কাল সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে একবার পশ্চিম দিকের সোনার সূর্যাস্ত এবং একবার পুব দিকের রুপোর চন্দ্রোদয়ের দিকে ফিরে, গোঁফে তা দিতে দিতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলুম। রুগ্ন ছেলের দিকে মা যেমন করে তাকায় প্রকৃতি সেইরকম সুগভীর স্তব্ধ এবং স্নিগ্ধ বিষাদের সঙ্গে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল, নদীর জল আকাশের মতো স্থির এবং আমাদের দুটি বাঁধা নৌকো জলচর পাখির মতো মুখের উপর পাখা ঝেঁপে স্থির ভাবে ঘুমিয়ে আছে। এমন সময় মৌলবি এসে আমাকে ভীতকণ্ঠে চুপি চুপি খবর দিলে, 'কলকাতার ভজিয়া আয়ছে।' এক মুহূর্তের মধ্যে কতরকম অসম্ভব আশঙ্কা যে মনে উদয় হল তা আর বলতে পারি নে। যা হোক, মনের চাঞ্চল্য দমন করে গম্ভীর স্থির ভাবে আমার রাজ-চৌকিতে এসে বসে ভজিয়াকে ডেকে পাঠালুম। ভজিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করেই কাঁদুনির সুর ধরে আমার পা জড়িয়ে ধরলে তখনই বুঝলুম, দুর্ঘটনা যদি কারও হয়ে থাকে তো সে ভজিয়ার। তার পরে তার সেই বাঁকা বাংলার সঙ্গে নাকের সুর এবং চোখের জল মিশিয়ে বিস্তর অসংলগ্ন ঘটনা ব'লে যেতে লাগল। বহু কষ্টে তার যা সার সংগ্রহ করা গেল সেটি হচ্ছে এই, ভজিয়া এবং ভজিয়ার মায়ে প্রায়ই ঝগড়া বেধে থাকে— কিছুই আশ্চর্য নয়, কারণ, দুজনেই আমাদের পশ্চিম-আর্যাবর্তের বীরাঙ্গনা, কেউ হৃদয়ের কোমলতার জন্যে প্রসিদ্ধ নয়— এর মধ্যে একদিন সন্ধ্যাবেলায় মায়ে ঝিয়ে মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল; স্নেহালাপ থেকে যে আলিঙ্গন তা নয়,

গালাগালি থেকে মারামারি। সেই বাহুযুদ্ধে তার মায়েরই পতন হয়, এবং সে কিছু গুরুতর আহতও হয়েছিল। ভজিয়া বলে, তার মা তাকে একটা কাঁসার বাটি নিয়ে মস্তক লক্ষ্য করে তাড়া করে, সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করাতে দৈবাৎ তার বালাটা তার মায়ের মাথায় না কোথায় লেগে রক্তপাত হয়। যা হোক, এই-সব ব্যাপারে সেই মুহূর্তেই তাকে তেতালা থেকে নিম্নলোকে নির্বাসিত করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা তিন-চার দিন হয়েছে, কিন্তু আমি কোনো খবরই পাই নি— মাথার উপরে একেবারে হঠাৎ বিনা নোটিশে ভজিয়াঘাত।

শিলাইদহ
২ কার্তিক
অক্টোবর ১৮৯১

আমার বোধ হয় কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে এলেই মানুষের নিজের স্থায়িত্ব এবং মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস অনেকটা হ্রাস হয়ে আসে। এখানে মানুষ কম এবং পৃথিবীটাই বেশি; চারি দিকে এমন-সব জিনিস দেখা যায় যা আজ তৈরি ক'রে কাল মেরামত ক'রে পরশু-দিন বিক্রি ক'রে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চিরদিন অটল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিদিন সমান ভাবে যাতায়াত করছে এবং চিরকাল অবিশ্রান্ত ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষ ভাবে দেখি নে। যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি কলরব-সহকারে গাছপালা গ্রাম নগরের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চিরকাল ধরে চলেছে— এ আর ফুরোয় না। মেন মে কাম্ অ্যাণ্ড্ মেন মে গো, বাট আই গো-অন ফর এভার— কথাটা ঠিক সংগত নয়। মানুষও নানা শাখা প্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে— তার এক প্রান্ত জন্মশিখরে, আর-এক প্রান্ত মরণসাগরে; দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি; কোনো কালে এর আর শেষ নেই। ওই শোনো মাঠে চাষা গান গাচ্ছে, জেলেডিঙি ভেসে চলেছে, বেলা যাচ্ছে, রৌদ্র ক্রমেই বেড়ে উঠছে, ঘাটে কেউ স্নান করছে কেউ জল নিয়ে যাচ্ছে— এমনি ক'রে এই শান্তিময়ী নদীর দুই তীরে, গ্রামের মধ্যে, গাছের ছায়ায়, শত শত বৎসর গুন্‌গুন্ শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে— এবং সকলের মধ্যে থেকে একটা করুণ ধ্বনি জেগে উঠছে: আই গো-অন ফর

এভার। দুপুর বেলার নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন কোনো রাখাল দূর থেকে ঊর্ধ্বকণ্ঠে তার সঙ্গীকে ডাক দেয়, এবং একটা নৌকো ছপ্ ছপ্ শব্দ ক'রে ঘরের দিকে ফিরে যায়, এবং মেয়েরা ঘড়া দিয়ে জল ঠেলে দেয় তারই ছল্‌ছল্ শব্দ ওঠে, তার সঙ্গে মধ্যাহ্নপ্রকৃতির নানারকম অনির্দিষ্ট ধ্বনি— দুই-একটা পাখির ডাক, মৌমাছির গুন্ গুন্, বাতাসে বোটটা আস্তে আস্তে বেঁকে যেতে থাকে তারই একরকম কাতর সুর— সবসুদ্ধ এমন একটা করুণ ঘুমপাড়ানি গান, যেন মা সমস্ত বেলা বসে বসে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, বলছে 'আর ভাবিস নে, আর কাঁদিস নে, আর কাড়াকাড়ি মারামারি করিস নে, আর তর্কবিতর্ক রাখ্, একটুখানি ভুলে থাক্, একটুখানি ঘুমো'— ব'লে তপ্ত কপালে আস্তে আস্তে করাঘাত করছে।

শিলাইদহ

সোমবার। ৩ কার্তিক

কোজাগর পূর্ণিমার দিন, নদীর ধারে ধারে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম আর মনের মধ্যে স্বগত কথোপকথন চলছিল; ঠিক 'কথোপকথন' বলা যায় না, বোধ হয় আমি একলাই বকে যাচ্ছিলুম আর আমার সেই কাল্পনিক সঙ্গীটি অগত্যা চুপচাপ ক'রে শুনে যাচ্ছিল, নিজের হয়ে একটা জবাব দেওয়াও সে বেচারার জো ছিল না; আমি তার মুখে যদি একটা নিতান্ত অসংগত কথাও বসিয়ে দিতুম তা হলেও তার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু কী চমৎকার হয়েছিল, কী আর বলব। কতবার বলেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ কিছুতেই বলা যায় না। নদীতে একটি রেখামাত্র ছিল না; ও—ই সেই চরের পরপারে যেখানে পদ্মার জলের শেষ প্রান্ত দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে আর এপর্যন্ত একটি প্রশস্ত জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্‌ঝিক্ করছে; একটি লোক নেই, একটি নৌকো নেই, ও পারের নতুন চরে একটি গাছ নেই, একটি তৃণ নেই— মনে হয়, যেন একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীন চাঁদের উদয় হচ্ছে, জনশূন্য জগতের মাঝখান দিয়ে একটি লক্ষ্যহীন নদী বহে চলেছে, মস্ত একটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে, আজ সেই-সব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই, কেবল সেই গল্পের 'তেপান্তরের মাঠ' এবং 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করছে।

আমি যেন সেই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটিমাত্র নাড়ীর মতো আস্তে আস্তে চলছিলুম। আর-সকলে ছিল আর-এক পারে, জীবনের পারে; সেখানে এই বৃটিশ গবর্মেণ্ট্ এবং উনবিংশ শতাব্দী এবং চা

এবং চুরোট। কত দিন থেকে কত লোক আমার মতো এইরকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করেছে এবং কত কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু হে অনির্বচনীয়, এ কী, এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্‌বেগ— এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কী, অর্থ কী— হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণ করে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে!

৪০

শিলাইদহ

রবিবার। ৪ জানুয়ারি ১৮৯২

কিছু আগেই পাবনা থেকে এ— তার মেম এবং কচিকাচা নিয়ে এসে উপস্থিত। মেম চা খায়, আমার চা নেই; মেম ছেলেবেলা থেকে ডাল দু চক্ষে দেখতে পারে না, আমি অন্য খাদ্যের অভাবে ডাল তৈরি করতে দিয়েছি; মেম ইয়ার্‌স্ এণ্ড্ টু ইয়ার্‌স্ এণ্ড্ মাছ ছোঁয় না, আমি মাগুর মাছের ঝোল রাঁধিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। কী ভাগ্যি, কানট্রি স্যুইট্‌স্ ভালোবাসে, তাই একটা বহু কালের শক্ত শুকনো সন্দেশ বহু কষ্টে কাঁটা দিয়ে ভেঙে খেলে। এক বাক্স বিস্কুট গতবারের রসদের অবশেষস্বরূপে ছিল, সেটা কাজে লাগবে। আমি আবার একটা মস্ত গলদ করেছি; আমি সাহেবকে বলেছি, 'তোমার মেম চা খায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার চা নেই, কোকো আছে।' সে বললে, 'আমার মেম চায়ের চেয়ে কোকো বেশি ভালো-বাসে।' আমি আল্‌মারি ঘেঁটে দেখি কোকো নেই, সবগুলোই কলকাতায় ফিরে গেছে। আবার তাকে বলতে হবে, চা'ও নেই, কোকোও নেই, পদ্মার জল আর চায়ের কাৎলি আছে। দেখি কী রকম মুখের ভাব হয়। সাহেবের ছেলে দুটো এমন দুরন্ত, এবং দুষ্টু দেখতে, সে আর কী বলব। মাঝে মাঝে সাহেবে মেমেতে খুব গুরুতর ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে, আমি এ বোট থেকে শুনতে পাচ্ছি। ছেলেদের কান্না, চাকর-বাকরদের চেঁচামেচি এবং দম্পতীর তর্ক-বিতর্কের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি। আজ আর কোনো কাজকর্ম-লেখাপড়ার সুবিধে দেখছি নে। মেমটা তার ছেলেকে ধমকাচ্ছে, 'What a little শুয়ার you are!' দেখ তো, আমার ঘাড়ে এ-সব উপদ্রব কেন!

শিলাইদহ

সোমবার। ৬ জানুয়ারি ১৮৯২

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গরমের সময় যখন বোটে ছিলুম, এই সময়টা বোটের জানলার কাছে বসে আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতুম ; নদীর শব্দে, সন্ধ্যার বাতাসে, নক্ষত্র-ভরা আকাশের নিস্তব্ধতায় মনের সমস্ত কল্পনা মধুর আকার ধরে আমাকে ঘিরে বসত ; অনেক রাত পর্যন্ত একপ্রকার নিবিড় নির্জন আনন্দে কেটে যেত। শীতকালের সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত প্রকৃতিকে বাইরে ফেলে জানলা দরজা বন্ধ ক'রে বোটের এই ক্ষুদ্র কাষ্ঠময় গহ্বরের মধ্যে একটি বাতি জ্বেলে মনটাকে তেমন দৌড় দিতে পারি নে ; যেন নিজের সঙ্গে নিজেকে বড়ো বেশি ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়। এরকম অবস্থায় আপনার মনটিকে নিয়ে থাকা বড়ো শক্ত।

সাহিত্যের মধ্যে দুটিমাত্র গল্পের বই এনেছিলুম, কিন্তু এমনি আমার পোড়াকপাল, আজ বিদায় নেবার সময় সাহেবের মেম সেই দুটি বই ধার নিয়ে গেছেন ; কবে শোধ করবেন তার কোনো ঠিকানা নেই। সেই দুটো হাতে তুলে নিয়ে সলজ্জ কাকুতির ভাবে আরম্ভ করলেন, 'মিস্টার টাগোর, বুড ইয়ু'— কথাটা শেষ করতে না করতে আমি খুব সজোরে ঘাড় নেড়ে বললুম, 'সার্টেন্‌লি !' এতে কতটা দূর কী বোঝায় ঠিক বলতে পারি নে। আসলে, তাঁরা তখন বিদায় নিচ্ছিলেন, সেই উৎসাহে আমি আমার অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে ফেলতে পারতুম। (যে পেত তার যে খুব বেশি লাভ হ'ত তা নয়।) যা হোক, তারা আজ গেছে। আমার এই দুটো দিন একেবারে ঘুলিয়ে দিয়ে গেছে ; আবার থিতিয়ে নিতে দু দিন যাবে। মেজাজটা এমনি খারাপ হয়ে আছে যে ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে কাউকে অন্যায়

অকারণে তাড়না করে উঠি ; এত বেশি সাবধানে আছি যে, সহজ অবস্থায় যখন একজনকে ধমক দিতুম, এখন তাকে খুব নরম নরম করে বলছি। মেজাজ বিগড়ে গেলে অনেক সময় আমার এইরকম উলটোরকম ব্যাপার হয়। সে সময়ে ছেলেরা কাছে থাকলে ভয় হয়, পাছে তাদের লঘুদোষে গুরুদণ্ড দিই ; এইজন্যে তাদের দণ্ডই দিই নে, খুব দৃঢ় করে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে থাকি।

শিলাইদহ

বৃহস্পতিবার। ৯ জানুয়ারি ১৮৯২

দুই-এক দিন থেকে এখানকার প্রকৃতি শীত এবং বসন্তের মধ্যে ইতস্তত করছে। সকালে হয়তো উত্তরে বাতাসে জলে স্থলে হী হী ধরিয়ে দিয়ে গেল, সন্ধ্যাবেলায় শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় দক্ষিনে বাতাসে চারি দিক হূ হূ করে উঠল। বসন্ত অনেকটা এসে পৌঁচেছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে। অনেক দিন পরে আজকাল ও পারের বাগান থেকে একটা পাপিয়া ডাকতে আরম্ভ করেছে। মানুষের মনটাও কতকটা বিচলিত হয়ে উঠছে। আজকাল সন্ধ্যা হলে ও পারের গ্রাম থেকে গান-বাজনার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, লোকে দরজা জানলা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়। আজ পূর্ণিমারাত। ঠিক আমার বাঁ দিকের খোলা জানলার উপরেই একটা মস্ত চাঁদ উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে; বোধ হয় দেখছে, আমি চিঠিতে তার সম্বন্ধে কোনো নিন্দে করছি কিনা। সে হয়তো মনে করে, তার জ্যোৎস্নার চেয়ে তার কলঙ্কের কথা নিয়েই পৃথিবীর লোকে বেশি কানাকানি করে। নিস্তব্ধ চরে একটা টিটি পাখি ডাকছে, নদী স্থির, নৌকো নেই, জলের উপর স্থির ছায়া ফেলে ও পারের ঘনীভূত বন স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে— ঘুমন্ত চোখ খোলা থাকলে যেমন দেখতে হয়, এই প্রকাণ্ড পূর্ণিমার আকাশ সেইরকম ঈষৎ ঝাপসা দেখাচ্ছে। কাল সন্ধ্যা থেকে আবার ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের সূত্রপাত হবে। কাল কাছারি সেরে এই ছোটো নদীটি পার হবার সময় দেখতে পাব, আমার সঙ্গে আমার এই প্রবাসের প্রণয়িনীর একটুখানি বিচ্ছেদ হয়েছে; কাল যে আমার কাছে

আপনার রহস্যময় অপার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিল আজ তার মনে যেন একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে ; যেন তার মনে হচ্ছে, একেবারে এতখানি আত্মপ্রকাশ কি ভালো হয়েছিল। তাই হৃদয় আবার একটু একটু ক'রে বন্ধ করছে। বাস্তবিক, বিদেশে বিজন অবস্থায় প্রকৃতি বড়ো কাছাকাছির জিনিস। আমি সত্য সত্য দু-তিন দিন ধরে মাঝে মাঝে ভেবেছি, পূর্ণিমার পরদিন থেকে আমি আর এ জ্যোৎস্না পাব না ; আমি যেন বিদেশ থেকে আরও একটু বিদেশে চলে যাব ; কাজকমের পরে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় যে একটি শান্তিময় পরিচিত সৌন্দর্য আমার জন্যে নদীতীরে অপেক্ষা ক'রে থাকত সে আর থাকবে না, অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বোটে ফিরে আসতে হবে।

কিন্তু আজ পূর্ণিমা, এ বৎসরকার বসন্তের এই প্রথম পূর্ণিমা। এর কথাটা লিখে রেখে দিলুম। হয়তো অনেক দিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে— ওই টিটি পাখির ডাক-সুদ্ধ এবং ও পারের ওই বাঁধা নৌকোয় যে আলোটি জ্বলছে সেটি-সুদ্ধ ; এই একটুখানি উজ্জ্বল নদীর রেখা, ওই একটুখানি অন্ধকার বনের একটা পোঁচ, এবং ওই নির্লিপ্ত উদাসীন পাণ্ডুবর্ণ আকাশ।

শিলাইদহ

শুক্রবার। ৭ এপ্রিল ১৮৯২

সকাল থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে, কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। বোধ হয় এগারোটা কিম্বা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে, কিন্তু এপর্যন্ত লেখা পড়া কিম্বা কোনো কাজে হাত দিই নি। সকাল থেকে একটি চৌকিতে স্থির হয়ে বসে আছি। মাথার মধ্যে কত টুকরো টুকরো লাইন এবং কত অসমাপ্ত ভাব যাতায়াত করছে, কিন্তু সেগুলোকে একত্র ক'রে বাঁধি কিম্বা পরিস্ফুট ক'রে তুলি এমন শক্তি অনুভব করছি নে। সেই গানটা মনে পড়ছে 'পায়েরিয়া বাজে, ঝনক ঝনক ঝন ঝন নন নন নন', সুন্দর সকাল বেলায় মধুর বাতাসে নদীর মাঝখানে মাথার মধ্যে সেইরকম ঝন-নন নূপুর বাজছে ; কিন্তু সে কেবল এ দিক ও দিক থেকে, অন্তরালে। কেউ ধরা দিচ্ছে না, দেখা দিচ্ছে না। তাই চুপচাপ ক'রে বসে আছি। নদীর জল অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, কোথাও এক কোমরের বেশি জল আর প্রায় নেই, তাই বোটটাকে নদীর প্রায় মাঝখানে বেঁধে রাখা কিছুই শক্ত হয় নি। আমার ডান দিকের পারে চরের উপরে চাষারা চাষ করছে এবং মাঝে মাঝে গোরুকে জল খাইয়ে নিয়ে যাচ্ছে ; আমার বাম পারে শিলাইদহের নারকেল এবং আম -বাগান, ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, জল তুলছে, স্নান করছে এবং উচ্চৈঃস্বরে বাঙাল ভাষায় হাস্যালাপ করছে ; যারা অল্প-বয়সী মেয়ে তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না। একবার স্নান সেরে উপরে উঠছে, আবার ঝুপ্ ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাদের নিশ্চিন্ত উচ্চহাস্য শুনতে বেশ লাগে। পুরুষরা গম্ভীর ভাবে এসে গোটাকতক ডুব মেরে তাদের নিত্যকর্ম সমাপ্ত ক'রে

চলে যায়— কিন্তু মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব— পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে। জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছল্ ছল্ জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে— একটা বেশ সহজ গতি ছন্দ তরঙ্গ, দুঃখতাপে অল্পে অল্পে শুকিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মতো দুখানা হয়ে ভেঙে যায় না। সমস্ত কঠিন পৃথিবীকে সে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গন করে আছে, পৃথিবী তার অন্তরের গভীর রহস্য বুঝতে পারে না। সে নিজে শস্য উৎপাদন করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে না থাকলে পৃথিবীতে একটি ঘাসও গজাতে পারত না। মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা ক'রে টেনিসন বলেছেন : Water unto wine ! আমার আজকের মনে হচ্ছে জল unto স্থল। তাই জন্যে মেয়েতে ও জলেতে বেশ মিশ খায়। অন্য অনেকরকম ভারবহন মেয়েকে শোভা পায় না ; কিন্তু উৎস থেকে, কুয়ো থেকে, ঘাট থেকে, জল তুলে নিয়ে যাওয়া কোনো কালেই মেয়েদের পক্ষে অসংগত মনে হয় না। গা ধোওয়া. স্নান করা, পুকুরের ঘাটে এক-কোমর জলে ব'সে পরস্পর গল্প করা, এ-সমস্ত মেয়েদের পক্ষে কেমন শোভন। আমি দেখেছি, মেয়েরা জল ভালোবাসে, কেননা উভয়ে স্বজাত। অবিশ্রাম সহজপ্রবাহ এবং কলধ্বনি, জল এবং মেয়ে ছাড়া আর-কারও নেই। ইচ্ছে করলে আরও অনেক সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারত, কিন্তু বেলাও বোধ করি অনেক হয়েছে এবং একটা কথাকে নিয়ে বেশি নেংড়ানো কিছু নয়।

শিলাইদহ

৮ এপ্রিল ১৮৯২

এখানে এসে আমি এত এলিমেণ্ট্‌স্‌ অফ পলিটিক্স্‌ এবং প্রব্লেম্‌স্‌ অফ দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাই নে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরিজি নাম্‌, ইংরিজি সমাজ, লণ্ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িংরুম, এবং যতরকম হিজিবিজি হাঙ্গাম। বেশ সাদাসিদে সহজ, সুন্দর, উন্মুক্ত এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল, কোমল, সুগোল, করুণ কিছুই খুঁজে পাই নে। কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস; কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে, তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে, তার থেকে নতুন নতুন থিওরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোটো নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসার, দুই কূলের অবিরল শান্তি এবং চারি দিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে। এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর ক'রে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম, তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হ'ত। বেশ ছোটো নদীর কলরবের মতো; ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি মিষ্টকণ্ঠস্বর এবং ছোটোখাটো কথাবার্তার মতো; বেশ নারকেল-পাতার ঝুর্‌ঝুর্‌ কাঁপুনি, আম-বাগানের ঘন ছায়া এবং প্রস্ফুটিত শর্ষেখেতের গন্ধের মতো— বেশ

সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়, অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং করুণতায় পরিপূর্ণ। মারামারি, হানাহানি, যোঝাঝুঝি, কান্নাকাটি, সে-সমস্ত এই ছায়াময় নদীস্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের নয়। যাই হোক, এলিমেণ্ট্স্ অফ পলিটিক্স্ জলের উপরে তেলের মতো এখানকার নিস্তব্ধ শান্তির উপর দিয়ে অবাধে ভেসে চলে যায়; একে কোনো রকমে নাড়া দিয়ে ভেঙে দেয় না।

নদীর মাঝখানে বসে আছি, দিনরাত্রি হু হু ক'রে বাতাস দিচ্ছে, দুই দিকের দুই পার পৃথিবীর দুটি আরম্ভরেখার মতো বোধ হচ্ছে— ওখানে জীবনের কেবল আভাস মাত্র দেখা দিয়েছে, জীবন সুতীব্র ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি; যারা জল তুলছে, স্নান করছে, নৌকো বাচ্ছে, গোরু চরাচ্ছে, মেঠো পথ দিয়ে আসছে যাচ্ছে, তারা যেন যথেষ্ট জীবন্ত সত্য নয়। অন্য জায়গায় মানুষরা ভিড় করে, তারা সামনে উপস্থিত হলে চিন্তার ব্যাঘাত করে, তাদের অস্তিত্বই যেন কুনুই দিয়ে ঠেলা দেয়, তারা প্রত্যেকে এক-একটি পজিটিভ মানুষ। এখানকার এরা সম্মুখে আনাগোনা চলাবলা কাজকর্ম করছে, কিন্তু মনকে ঠেলা দিয়ে যাচ্ছে না। কৌতূহলে সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে, কিন্তু সেই সরল কৌতূহল ভিড় ক'রে গায়ের উপর এসে পড়ছে না। যা হোক, বেশ লাগছে।

৪৫

বোলপুর
শনিবার। ২ মে ১৮৯২

জগৎসংসারে অনেকগুলো প্যারাডক্স্ আছে। তার মধ্যে এও একটি যে, যেখানে বৃহৎ দৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ, গভীর ভাব, অর্থাৎ যেখানে অনন্তের আবির্ভাব, সেখানে তার উপযুক্ত সঙ্গী একজন মানুষ— অনেকগুলো মানুষ ভারি ক্ষুদ্র এবং খিজিবিজি। অসীমতা এবং একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ, আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকবার যোগ্য। আর, কতকগুলো মানুষে একত্রে থাকলে তারা পরস্পরকে ছেঁটেছুঁটে অত্যন্ত খাটো করে রেখে দেয়; একজন মানুষ যদি আপনার সমস্ত অন্তরাত্মাকে বিস্তৃত করতে চায় তা হলে এত বেশি জায়গার আবশ্যক করে যে কাছাকাছি পাঁচ-ছ জনের স্থান থাকে না। অধিক লোক জোটাতে গেলেই পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হয়, যেখানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়। মাঝের থেকে, দুই বাহু প্রসারিত ক'রে দুই অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে, প্রকৃতির এই অগাধ অনন্ত বিস্তীর্ণতাকে গ্রহণ করতে পারছি নে।

৪৬

বোলপুর

শুক্রবার। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯২

রসিকতা জিনিসটা বড়ো বিপদের জিনিস। ও যদি প্রসন্ন সহাস্য-মুখে আপনি ধরা দিলে তো অতি উত্তম, আর ওকে নিয়ে যদি টানাটানি করা যায় তবে বড়োই 'ব্যাভ্রম' হবার সম্ভাবনা। হাস্যরস প্রাচীনকালের ব্রহ্মাস্ত্রের মতো; যে ওর প্রয়োগ জানে সে ওকে নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে, আর যে হতভাগ্য ছুঁড়তে জানে না অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে'— হাস্যরস তাকেই হাস্যজনক ক'রে তোলে।

মেয়েরা রসিকতা করতে গিয়ে যদি মুখরা হয়ে পড়ে তবে সেটা ভারি অশোভন দেখতে হয়। আমার তো মনে হয় 'কমিক' হতে চেষ্টা ক'রে সফল হলেও মেয়েদের সাজে না, নিষ্ফল হলেও মেয়েদের সাজে না। কারণ 'কমিক' জিনিসটা ভারি গাব্‌দা এবং প্রকাণ্ড। 'সাব্লিমিটি'র সঙ্গে 'কমিক্যালিটি'র একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে; সেইজন্যে হাতি কমিক, উট কমিক, জিরাফ কমিক, স্থূলতা কমিক। সৌন্দর্যের সঙ্গে বরঞ্চ প্রখরতা শোভা পায়, যেমন ফুলের সঙ্গে কাঁটা। তেমনি শাণিত কথা মেয়েদের মুখে বড্ড বাজে বটে, তেমনি সাজেও বটে। কিন্তু যে-সকল বিদ্রূপে কোনোরকম স্থূলত্বের আভাসমাত্র দেয়, তার দিক দিয়েও মেয়েদের যাওয়া উচিত হয় না; সে হচ্ছে আমাদের সাব্লাইম স্বজাতীয়ের জন্যে। পুরুষ ফল্‌স্টাফ আমাদের হাসিয়ে নাড়ী ছিঁড়ে দিতে পারে, কিন্তু মেয়ে ফল্‌স্টাফ আমাদের গা জ্বালিয়ে দিত।

৪৭

বোলপুর

শনিবার। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯২

কাল যে ঝড় সে আর কী বলব। আমার 'সাধনা'র নিত্যনৈমিত্তিক লেখা সেরে চা খাবার জন্যে উপরে যাচ্ছি, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় এসে উপস্থিত। ধুলোয় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং বাগানের যত শুকনো পাতা একত্র হয়ে লাটিমের মতো বাগানময় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল; যেন অরণ্যের যত প্রেতাত্মাগুলো হঠাৎ জেগে উঠে ভুতুড়ে নাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে। বাগানের সমস্ত গাছপালা পায়ে শিকলি-বাঁধা প্রচণ্ড জটায়ুপাখির মতো ডানা আছড়ে ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্ করতে লাগল। সে কী গর্জন, কী মাতামাতি, কী একটা লুটোপুটি ব্যাপার। ঝড়টা দেখে আমার মনে পড়ছিল, আমেরিকার ranch সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যেরকম বর্ণনা পড়া যায়— হঠাৎ কোনো একটা বেড়া ভেঙে ফেলে ছ-সাত শো বুনো ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে, আর তার পিছনে পিছনে তাদের তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্যে বড়ো বড়ো ফাঁস হাতে অনেকগুলো অশ্বারোহী ছুটেছে; মাঝে মাঝে যেখানে যাকে পাচ্ছে সাঁই সাঁই শব্দে দিচ্ছে চাব্‌কে— বোলপুরের অবারিত আকাশ এবং মাঠের মধ্যে যেন সেই রকমের একটা উচ্ছৃঙ্খল পলায়ন এবং পশ্চাদ্ধাবন চলছে— দৌড়্-দৌড়্ ধর্-ধর্ পালা'-পালা' হুড়্-মুড় দুড়-দাড়্ ব্যাপার।

বোলপুর

মঙ্গলবার। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯২

পূর্বেই লিখেছি, অপরাহ্লে আমি আপন-মনে একাকী ছাতের উপর বেড়াই; কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার দুই বন্ধুকে দুই পার্শ্বে নিয়ে অঘোরকে আমার পথপ্রদর্শক ক'রে তাঁদের এখানকার প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করানো আমার কর্তব্য মনে করে বেরিয়ে পড়া গেল। তখন সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু অন্ধকার হয় নি। একেবারে দিগন্তের প্রান্তে যেখানে গাছের সার নীলবর্ণ হয়ে দেখা যাচ্ছে তারই উপরেই ঠিক একটি রেখামাত্র খুব গাঢ় নীল মেঘ উঠে খুব চমৎকার দেখতে হয়েছে। আমি তারই মধ্যে একটুখানি কবিত্ব ক'রে বললুম, ঠিক যেন নীল চোখের পাতার উপরে নীল সুর্মা লাগিয়েছে; সঙ্গীরা কেউ কেউ শুনতে পেলে না, কেউ কেউ বুঝতে পারলে না, কেউ কেউ সংক্ষেপে বললে, 'হাঁ, দিব্যি দেখতে হয়েছে'। তার পর থেকে দ্বিতীয় বার কবিত্ব করতে আমার উৎসাহ হল না। প্রায় মাইল-খানেক গিয়ে একটা বাঁধের ধারে এক সার তালবন এবং তালবনের কাছে একটা মেঠো ঝর্‌নার মতো আছে, সেইটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, এমন সময়ে দেখি উত্তরে সেই নীল মেঘ অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং স্ফীত হয়ে চলে আসছে এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্‌দন্ত বিকাশ করছে। আমাদের সকলেরই মত হল এরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘরের মধ্যে ব'সে দেখাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। বাড়িমুখে যেমন ফিরেছি অমনি প্রকাণ্ড মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোষ গর্জনে একটা ঝড় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। আমরা যখন প্রকৃতিসুন্দরীর চোখের সুর্মার বাহার নিয়ে তারিফ করছিলুম তখন তিলমাত্র আশঙ্কা করি নি যে, তিনি রোষাবিষ্টা গৃহিণীর মতো এত

বড়ো একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত নিয়ে আমাদের উপর ছুটে আসবেন। ধুলোয় এমনি অন্ধকার হয়ে এল যে পাঁচ হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল; কাঁকরগুলো বায়ুতাড়িত হয়ে ছিটেগুলির মতো আমাদের বিঁধতে লাগল; মনে হল বাতাস পিছন থেকে ঘাড় ধরে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে; ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পিট্ পিট্ ক'রে মুখের উপর সবেগে আঘাত করতে লাগল। দৌড় দৌড়। মাঠ সমান নয়। এক-এক জায়গায় আবার খোয়াইয়ের ভিতর নাবতে হয়, সেখানে সহজ অবস্থাতেই চলা শক্ত, এই ঝড়ের বেগে চলা আরও মুশকিল। পথের মধ্যে আবার পায়ে কাঁটাসুদ্ধ একটা শুকনো ডাল বিঁধে গেল; সেটা ছাড়াতে গিয়ে, বাতাস আবার পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ থুবড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। বাড়ির যখন প্রায় কাছাকাছি এসেছি তখন দেখি, তিন-চারটে চাকর মহা সোরগোল ক'রে দ্বিতীয় আর-একটা ঝড়ের মতো আমাদের উপরে এসে পড়ল। কেউ হাত ধরে, কেউ আহা-উহু বলে, কেউ পথ দেখাতে চায়, কেউ আবার মনে করে বাবু বাতাসে উড়ে যাবেন, ব'লে পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরে। এই সমস্ত অনুচরদের দৌরাত্ম্য কাটিয়ে-কুটিয়ে, এলোমেলো চুলে, ধূলিমলিন দেহে, সিক্ত বস্ত্রে, হাঁপিয়ে বাড়িতে এসে তো পড়লুম। যা হোক, একটা খুব শিক্ষালাভ করেছি। হয়তো কোন্‌দিন কোন্ কাব্যে কিম্বা উপন্যাসে বর্ণনা করতে বসতুম, একজন নায়ক মাঠের মধ্যে দিয়ে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি ভেঙে নায়িকার মধুর মুখচ্ছবি স্মরণ ক'রে অকাতরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু, এখন আর এরকম মিথ্যা কথা লিখতে পারব না; ঝড়ের সময় কারও মধুর মুখ মনে রাখা অসম্ভব— কী করলে চোখে কাঁকর ঢুকবে না সেই চিন্তাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। আমার আবার চোখে eye-glass ছিল; সেটা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে,

কিছুতেই রাখতে পারি নে। এক হাতে চষমা ধ'রে আর এক হাতে ধুতির কোঁচা সামলে, পথের কাঁটাগাছ এবং গর্ত বাঁচিয়ে চলছি। যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণয়িনীর বাড়ি থাকত, আমার চষমা এবং কোঁচা সামলাতুম না তার স্মৃতি সামলাতুম। বাড়িতে ফিরে এসে কাল অনেক ক্ষণ ভাবলুম— বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো মিষ্টি কবিতা লিখেছেন; কিন্তু একটা কথা ভাবেন নি, এরকম ঝড়ে কৃষ্ণের কাছে তিনি কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন। চুলগুলোর অবস্থা যে কিরকম হত সে তো বেশ বোঝা যাচ্ছে। বেশবিন্যাসেরই বা কিরকম দশা। ধুলোতে লিপ্ত হয়ে, তার উপর বৃষ্টির জলে কাদা জমিয়ে, কুঞ্জবনে কিরকম অপরূপ মূর্তি ক'রে গিয়েই দাঁড়াতেন! এসব কথা কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের লেখা পড়বার সময় মনে হয় না। কেবল মানসচক্ষে ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় একজন সুন্দরী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে বিকশিত কদম্ববনের ছায়া দিয়ে, যমুনার তীরপথে, প্রেমের আকর্ষণে, ঝড়-বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন। পাছে শোনা যায় ব'লে পায়ের নূপুর বেঁধে রেখেছেন, পাছে দেখা যায় ব'লে নীলাম্বরী কাঁপড় পরেছেন; কিন্তু পাছে ভিজে যান ব'লে ছাতা নেন নি, পাছে পড়ে যান ব'লে বাতি আনা আবশ্যক বোধ করেন নি। হায়, আবশ্যক জিনিসগুলো আবশ্যকের সময় এত বেশি দরকার, অথচ কবিত্বের বেলায় এত উপেক্ষিত! আবশ্যকের শতলক্ষ দাসত্ববন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দেবার জন্যে কবিতা মিথ্যে ভান করছে। ছাতা জুতো জামাজোড়া চিরকাল থাকবে। বরঞ্চ শোনা যায় সভ্যতার উন্নতি-সহকারে কাব্য ক্রমে লোপ পাবে, কিন্তু ছাতা-জুতোর নতুন নতুন পেটেন্ট্ বেরোতে থাকবে।

৪৯

বোলপুর

শনিবার। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯২

এখানে রাত্রে কোনো গির্জের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে না, এবং কাছাকাছি কোনো লোকালয় না থাকাতে পাখিরা গান বন্ধ করবা মাত্রই সন্ধ্যার পর থেকে একেবারে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা আরম্ভ হয়। প্রথম রাত্রি এবং অর্ধ রাত্রে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। কলকাতায় অনিদ্রার রাত্রি মস্ত একটা অন্ধকার নদীর মতো, খুব ধীরে ধীরে চলতে থাকে; বিছানায় চক্ষু মেলে চিৎ হয়ে পড়ে তার গতিশব্দ মনে মনে গণনা করা যেতে পারে। এখানকার রাত্রিটা যেন একটা প্রকাণ্ড নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতো— আগাগোড়া সমান থম্‌থম্ করছে, কোথাও কিছু গতি নেই। যতই এ পাশ ফিরি এবং যতই ও পাশ ফিরি, একটা মস্ত যেন অনিদ্রার গুমট ক'রে ছিল, তার মধ্যে প্রবাহের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। আজ সকালে কিছু বিলম্বে শয্যা ত্যাগ করে আমার নিচেকার ঘরের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে, বুকের উপর স্লেট রেখে, পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে, সকালের বাতাস এবং পাখির ডাকের মধ্যে একটি কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম। বেশ জমে এসেছিল— মুখ সহাস্য, চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত, মাথা ঘন ঘন আন্দোলিত এবং গুন্ গুন্ আবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল— এমন সময় একখানি চিঠি, একখানি সাধনা, একখানি সাধনার প্রুফ এবং একখানি Monist কাগজ পাওয়া গেল। চিঠিখানি পড়লুম এবং সাধনার পাতাগুলোর মধ্যে চোখ দু'টোকে একবার সবেগে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে এলুম। তার পরে পুনশ্চ শিরশ্চালন ক'রে অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে কবিত্বে প্রবৃত্ত হলুম। শেষ ক'রে ফেলে তবে অন্য কথা। একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন

আনন্দ হয়, হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন তাই ভাবছি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে ; বেশ যেন হাতে ক'রে তুলে নেবার মতো। আর, গদ্য যেন এক-বস্তা আল্‌গা জিনিস— একটি জায়গা ধরলে সমস্তটি অমনি স্বচ্ছন্দে উঠে আসে না; একেবারে একটা বোঝা বিশেষ। রোজ রোজ যদি একটি ক'রে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তা হলে জীবনটা বেশ একরকম আনন্দে কেটে যায়। কিন্তু এত দিন ধরে সাধনা করে আসছি, ও জিনিসটা এখনও তেমন পোষ মানে নি। প্রতিদিন লাগাম পরাতে দেবে তেমন পক্ষীরাজ ঘোড়াটি নয়। আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ—বেশ আপনাকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায় ; তার পরে আবার এই ভবকারাগারের মধ্যে ফিরে এসেও অনেক ক্ষণ কানের মধ্যে একটা ঝংকার, মনের মধ্যে একটা স্ফূর্তি লেগে থাকে। এই ছোটো ছোটো কবিতাগুলো আপনা-আপনি এসে পড়ছে ব'লে আর নাটকে হাত দিতে পারছি নে। নইলে দুটো-তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করছে। শীতকাল ছাড়া বোধ হয় সেগুলোতে হাত দেওয়া হয়ে উঠবে না। চিত্রাঙ্গদা ছাড়া আমার আর সব নাটকই শীতকালে লেখা। সে সময়ে গীতিকাব্যের আবেগ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে ; অনেকটা ধীরে সুস্থে নাটক লেখা যায়।

বোলপুর

৩১ মে ১৮৯২

এখনও পাঁচটা বাজে নি, কিন্তু আলো হয়েছে, বেশ বাতাস দিচ্ছে, এবং বাগানের সমস্ত পাখিগুলো জেগে উঠে গান জুড়ে দিয়েছে। কোকিলটা তো সারা হয়ে গেল। সে কেন যে এত অবিশ্রাম ডাকে এ পর্যন্ত বোঝা গেল না— অবশ্য, আমাদের শ্রুতি-বিনোদনের জন্যে নয়, বিরহিণীকে পীড়ন করবার অভিপ্রায়েও নয়, তার নিজের একটা পার্সোনাল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু হত-ভাগার সে উদ্দেশ্য কি কিছুতেই সিদ্ধ হচ্ছে না। ছাড়েও না তো— কুউ কুউ চলছেই। আবার এক-একবার যেন দ্বিগুণ অস্থির হয়ে দ্রুত বেগে কুহুধ্বনি করছে। এর মানে কী। আবার আর-খানিকটা দূরে আর-একটা কী পাখি নিতান্ত মৃদু স্বরে কুক্ কুক্ করছে— তাতে কিছুমাত্র উৎসাহ-আগ্রহের ঝাঁজ নেই ; লোকটা যেন নেহাত মন-মরা হয়ে গেছে, সমস্ত আশা ভরসা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু তবু ছায়ায় বসে সমস্ত দিন ওই একটুখানি কুক্ কুক্ কুক্ কুক্, ওটুকু ছাড়তে পারছে না। বাস্তবিক, ঐ ডানাওয়ালা ছোটো ছোটো নিরীহ জীবগুলি, অতি কোমল গ্রীবাটুকু বুকটুকু এবং পাঁচমিশালি রঙ নিয়ে গাছের ছায়ায় বসে আপন আপন ঘরকন্না করছে— ওদের আসল বৃত্তান্ত কিছুই জানি নে। বাস্তবিক, বুঝতে পারি নে ওদের এত ডাকবার কী আবশ্যক।

শিলাইদহ

সোমবার। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯২

এসব শিষ্টাচার আর ভালো লাগে না, আজকাল প্রায় বসে বসে আওড়াই 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন'। বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্যতা। ইচ্ছা করে, দিনরাত্রি বিচার-আচার বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীর-মনকে অকালে জরাগ্রস্ত না ক'রে, একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি। মনের সমস্ত বাসনা ভাবনা, ভালোই হোক, মন্দই হোক, বেশ অসংশয় অসংকোচ এবং প্রশস্ত যেন হয়— প্রথার সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে কাজের কোনোরকম অহর্নিশি খিটিমিটি না ঘটে। একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খুব উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছাড়া দিতে পারতুম, একেবারে দিগ্‌বিদিকে ঢেউ খেলিয়ে ঝড় বইয়ে দিতুম, একটা বলিষ্ঠ বুনো ঘোড়ার মতো কেবল আপনার লঘুত্বের আনন্দ-আবেগে ছুটে যেতুম! কিন্তু আমি বেদুইন নই, বাঙালি। আমি কোণে বসে বসে খুঁৎ খুঁৎ করব, বিচার করব, তর্ক করব, মনটাকে নিয়ে একবার ওল্‌টাব, একবার পাল্‌টাব— যেমন করে মাছ ভাজে, ফুটন্ত তেলে একবার এ পিঠ চিড়্‌বিড়্‌ ক'রে উঠবে, একবার ও পিঠ চিড়্‌বিড়্‌ করবে— যাক গে, যখন রীতিমত অসভ্য হওয়া অসাধ্য তখন রীতিমত সভ্য হবার চেষ্টা করাই সংগত। সভ্যতা এবং বর্বরতার মধ্যে লড়াই বাধাবার দরকার নেই।

৫২

শিলাইদহ

বুধবার। ১৬ জুন ১৮৯২

যতই একলা আপন-মনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায় ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজ ভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর-কিছু হতে পারে না। মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত তাই করছে; কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অত্যন্ত বেশি অতিক্রম করবার জন্যে চেষ্টা করছে না ব'লেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য। অথচ প্রত্যেকে যেটুকু করছে সেটুকু বড়ো সামান্য নয়— ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে তবে ঘাসরূপে টি'কে থাকতে পারে, তার শিকড়ের শেষ প্রান্তটুকু পর্যন্ত দিয়ে তাকে রসাকর্ষণ করতে হয়। সে যে নিজের শক্তি লঙ্ঘন ক'রে বটগাছ হবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে না, এইজন্যই পৃথিবী এমন সুন্দর শ্যামল হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক, বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বা-চৌড়া কথার দ্বারা নয়, কিন্তু প্রাত্যহিক ছোটো ছোটো কর্তব্যসমাধা-দ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে। কবিত্বই বল আর বীরত্বই বল, কোনোটাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু একটি অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যের মধ্যেও তৃপ্তি এবং সম্পূর্ণতা আছে। বসে বসে হাঁস্‌ফাঁস্‌ করা, কল্পনা করা, কোনো অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করা, এবং ইতিমধ্যে সম্মুখ দিয়ে সময়কে চলে যেতে দেওয়া, এর চেয়ে হেয় আর কিছু হতে পারে না। যখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যায়, নিজের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত কর্তব্য সত্যের সঙ্গে, বলের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে, সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে পালন করে যাব, এবং যখন

বিশ্বাস হয় তা করতে পারব, তখন সমস্ত জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ছোটোখাটো দুঃখবেদনা একেবারে দূর হয়ে যায়। অবশ্য, আমার জীবনের প্রতিদিন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত আমার সম্মুখে এখন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই, তাই হয়তো দূর থেকে হঠাৎ একটা কাল্পনিক আশার উচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়ে উঠছি, সমস্ত খুঁটিনাটি খিটিমিটি সংকট এবং সংঘর্ষ বাদ দিয়ে ভাবী জীবনের একটা মোটামুটি চিত্র অঙ্কিত ক'রে এতটা ভরসা পাচ্ছি, কিন্তু তা ঠিক নয়।

৫৩

শিলাইদহ

বুধবার। ২ আষাঢ় ১২৯৯

কাল আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক বেশ রীতিমত আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে। দিনের বেলাটা খুব গরম হয়ে বিকেলের দিকে ভারি ঘনঘটা মেঘ করে এল।

কাল ভাবলুম, বর্ষার প্রথম দিনটা আজ বরঞ্চ ভেজাও ভালো, তবু অন্ধকূপের মধ্যে দিন যাপন করব না। জীবনে '৯৯ সাল আর দ্বিতীয়বার আসবে না— ভেবে দেখতে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে— সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তা হলেও খুব দীর্ঘজীবন বলতে হবে। মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে, নিদেন আমার পক্ষে। আমি প্রায়ই এক-এক সময়ে ভাবি, এই-যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি ক'রে দিন আসছে— কোনোটি সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধনীল, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সাদা ফুলের মতো প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য! এবং এরা কি কম মূল্যবান! হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই-যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়— সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু বহু কালের শত শত সুখদুঃখ-বিরহমিলন-ময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথমদিবসঃ। সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতিবৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে, অবশেষে এক সময় আসবে, যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদূতের দিন, এই

ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদৃষ্টে আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। এ কথা ভালো করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে ; ইচ্ছে করে, জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই। আমি যদি সাধু প্রকৃতির লোক হতুম তা হলে হয়তো মনে করতুম, জীবন নশ্বর, অতএব প্রতিদিন বৃথা ব্যয় না করে সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। কিন্তু আমার সে প্রকৃতি নয়— তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে, এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে! এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোকভূলোকের মাঝখানের সমস্ত-শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! আর, আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছোয়, আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না— সে যেন আরও লক্ষ যোজন দূরে। রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে পড়ে যাচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না! সেই বিলেত যাবার পথে লোহিত-সমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে। কিন্তু ভাগ্যিস আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায় নি— অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই

একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখে নি। আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে। এমন এক-একটি দিন এক-একটি সম্পত্তির মতো! আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতালার ছাতের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চলশিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়, এইরকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণ-খণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাতে পড়ে থাকতুম, তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মতো একেবারে উপ্‌চে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত। যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এখানকার মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব, এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে, পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই জন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবিক পৃথিবীর জীব-গুলো ভারি অদ্ভুত। এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘ্যাটাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায় নি, সেই আশ্চর্য। এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পাল্‌কির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে! যদি বাসনা এবং সাধনা -অনুরূপ পরকাল থাকে তা হলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি। যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন ব'লে অবজ্ঞা করে। কিন্তু, এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে, সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।

আমি ভদ্রলোক সেজে শহরের বড়ো রাস্তায় আনাগোনা করছি, পরিপাটী ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথাবার্তা করে জীবন মিথ্যে কাটিয়ে দিচ্ছি। আমি অন্তরে অসভ্য, অভদ্র— আমার জন্যে কোথাও কি একটা ভারি সুন্দর অরাজকতা নেই? কতকগুলো খ্যাপা লোকের আনন্দমেলা নেই? কিন্তু, আমি কী এ-সমস্ত বকছি — কাব্যের নায়কেরা এইরকম সব কথা বলে, কন্‌ভেন্‌শ্যনালিটির উপরে তিন-চার-পাত-জোড়া স্বগত উক্তি প্রয়োগ করে, আপনাকে সমস্ত মানবসমাজের চেয়ে বড়ো মনে করে। বাস্তবিক, এ-সব কথা বলতে লজ্জা করে। এর মধ্যে যে সত্যটি আছে সে বহু কাল থেকে ক্রমাগত কথা চাপা পড়ে আসছে। পৃথিবীতে সবাই ভারি কথা কয়, তার মধ্যে আমি একজন অগ্রগণ্য। হঠাৎ এতক্ষণে সে বিষয়ে চেতনা হল।

পুঃ— আসল যে কথাটা বলতে গিয়েছিলুম সেটা ব'লে নিই, ভয় নেই, আবার চার পাতা জুড়বে না— কথাটা হচ্ছে, পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাস্।

৫৪

শিলাইদহ

শুক্রবার। ৪ আষাঢ় ১৮৯২

আজকাল আমি বিকেলে সন্ধ্যার দিকে ডাঙায় উঠে অনেক ক্ষণ বেড়াতে থাকি। পূর্বদিকে যখন ফিরি একরকম দৃশ্য দেখতে পাই, পশ্চিমে যখন ফিরি আর-একরকম দেখতে পাই— আকাশ থেকে আমার মাথার উপরে যেন সান্ত্বনা বৃষ্টি হতে থাকে, আমার দুই মুগ্ধ চোখের ভিতর দিয়ে যেন একটি স্বর্ণময় মঙ্গলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই বাতাসে আকাশে এবং আলোকে প্রতি ক্ষণে আমার মন ছেয়ে যেন নতুন পাতা গজিয়ে উঠছে; আমি নতুন প্রাণ এবং বলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছি। সংসারের সমস্ত কাজ করা এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা আমার পক্ষে ভারি সহজ হয়ে পড়েছে। আসলে সবই সোজা, একটিমাত্র সিধে রাস্তা আছে। চোখ চেয়ে সেই রাস্তা ধরে গেলেই হল, নানারকম বুদ্ধিপূর্বক short cut খোঁজবার দরকার দেখি নে; সুখ দুঃখ সকল রাস্তাতেই আছে, কোনো রাস্তা দিয়েই তাদের এড়িয়ে যাবার জো নেই, কিন্তু শান্তি কেবল এই বড়ো রাস্তাতেই আছে।

শিলাইদহ

বৃহস্পতিবার। ৩ ভাদ্র ১৮৯২

এমন সুন্দর শরতের সকালবেলা চোখের উপর যে কী সুধাবর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর, শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নব-যৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালো-বাসাবাসি চলছে, তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধ-সুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের খেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন— জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা। প্রেমের যেমন একটা গুণ আছে, তার কাছে জগতের মহা মহা ঘটনাও তুচ্ছ মনে হয়, এখানকার আকাশের মধ্যে তেমনি যে-একটি ভাব ব্যাপ্ত হয়ে আছে তার কাছে কলকাতার দৌড়ধাপ হাঁস্‌ফাঁস্ ধড়্‌ফড়ানি ঘড়্‌ঘড়ানি ভারি ছোটো এবং অত্যন্ত সুদূর মনে হয়। চার দিক থেকে আকাশ আলো বাতাস এবং গান একরকম মিলিতভাবে এসে আমাকে অত্যন্ত লঘু করে আপনাদের সঙ্গে যেন মিশিয়ে ফেলছে। আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎপ্রকৃতির উপর আর-এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে, তাতে ক'রে এই-সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপর আর-একটা যেন নেশার রঙ লেগে গেছে। বেশ লাগছে। 'কী জানি পরান কী যে চায়' বলতে লজ্জা বোধ হয় এবং শহরে থাকলে বলতুম না, কিন্তু ওটা ষোলো-আনা কবিত্ব হলেও এখানে বলতে দোষ নেই। অনেক পুরোনো শুকনো কবিতা, কলকাতায় যাকে উপহাসানলে জ্বালিয়ে ফেলবার যোগ্য মনে হয়, তারা এখানে আসবামাত্র দেখতে দেখতে মুকুলিত পল্লবিত হয়ে ওঠে।

৫৬

গোয়ালন্দের পথে

২১ জুন ১৮৯২

আজ সমস্ত দিন নদীর উপরে ভেসে চলেছি। আশ্চর্য এই বোধ হচ্ছে যে, কতবার এই রাস্তা দিয়ে গেছি, এই বোটে চড়ে জলে জলে বেড়িয়েছি, এবং নদীর দুই তীরের মাঝখান দিয়ে ভেসে যাবার যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে সে উপভোগ করেছি— কিন্তু দিনদুই ডাঙায় বসে থাকলে সেটা ঠিকটা আর মনে থাকে না। এই-যে একলাটি চুপ ক'রে বসে চেয়ে থাকা— দুই ধারে গ্রাম ঘাট শস্যক্ষেত্র চর বিচিত্র ছবি, দেখা দিচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে; আকাশে মেঘ ভাসছে এবং সন্ধের সময় নানারকম রঙ ফুটছে; নৌকো চলেছে, জেলেরা মাছ ধরছে, অহর্নিশি জলের একপ্রকার আদরপরিপূর্ণ তরল শব্দ শোনা যাচ্ছে; সন্ধেবেলায় বিস্তৃত জলরাশি শ্রান্ত নিদ্রিত শিশুর মতো একেবারে স্থির হয়ে যাচ্ছে এবং উন্মুক্ত আকাশের সমস্ত তারা মাথার উপরে জেগে চেয়ে আছে; গভীর রাত্রে যেদিন ঘুম নেই সেদিন উঠে বসে দেখি, অন্ধকারাচ্ছন্ন দুই কূল নিদ্রিত, মাঝে মাঝে কেবল গ্রামের বনে শৃগাল ডাকছে এবং পদ্মার নীরব খরস্রোতে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ ক'রে পাড় খসে খসে পড়ছে— এই-সমস্ত পরিবর্তনশীল ছবি যেমন যেমন চোখে পড়তে থাকে অমনি মনের ভিতরে একটা কল্পনার স্রোত বইতে থাকে এবং তার দুই পারে তটদৃশ্যের মতো নব নব আকাঙ্ক্ষার চিত্র দেখা দিতে থাকে। হয়তো সম্মুখের দৃশ্যটা খুব একটা চমৎকার কিছু নয়— একটা হল্‌দে রকমের তৃণতরুশূন্য বালির চর ধূ ধূ করছে, তারই গায়ে একটা জনশূন্য নৌকো বাঁধা রয়েছে এবং আকাশের ছায়ায় ফিকে নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে — দেখে মনের ভিতরে কিরকম করে বলতে পারি নে। বোধ হয়

সেই ছেলেবেলায় যখন আরব্য উপন্যাস পড়তুম, সিন্ধ্‌বাদ নানা নূতন দেশে বাণিজ্য করতে বাহির হত, ভৃত্যশাসিত আমি তোষাখানার মধ্যে রুদ্ধ হয়ে বসে বসে দুপুর বেলায় সিন্ধ্‌বাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম, তখন যে আকাঙ্ক্ষাটা মনের মধ্যে জন্মেছিল সেটা যেন এখনও বেঁচে আছে— ওই বালিচরে নৌকো বাঁধা দেখলে সেই যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় যদি আরব্য-উপন্যাস রবিন্‌সন্‌-ক্রুসো না পড়তুম, রূপকথা না শুনতুম, তা হলে নিশ্চয় বলতে পারি, ওই নদীতীর এবং মাঠের প্রান্তের দূর দৃশ্য দেখে ঠিক এমন ভাব মনে উদয় হত না; সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার পক্ষে আর-একরকম হয়ে যেত। এইটুকু মানুষের মনের ভিতরে বাস্তবিকে কাল্পনিকে জড়িয়ে-মড়িয়ে কী-যে একটা জাল পাকিয়ে আছে! কিসের সঙ্গে যে কী গেঁথে গেছে— কত গল্পের সঙ্গে, ছবির সঙ্গে, ঘটনার সঙ্গে, সামান্যের সঙ্গে, বড়োর সঙ্গে জড়িয়ে গিঁঠ পড়ে আছে— প্রতিদিন অজ্ঞাতে জড়িয়ে যাচ্ছে। একটা মানুষের একটা বৃহৎ জীবনের জাল খুলতে পারলে কত ছোটো এবং কত বড়োর মিশোল আলাদা করা যায়।

শিলাইদা

সোমবার। ২২ জুন ১৮৯২

আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম,ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্ছে। শুনে মনটা কেমন ঈষৎ বিকল হয়ে গেল, অথচ তার কারণ ভেবে পাওয়া শক্ত। বোধ হয় এইরকমের একটা আনন্দধ্বনিতে হঠাৎ অনুভব করা যায়, পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে যার অধিকাংশের সঙ্গেই আমার যোগ নেই, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম সুখদুঃখ উৎসব-আনন্দ চলছে। কী বৃহৎ পৃথিবী! কী বিপুল মানবসংসার! কত সুদূর থেকে জীবনের ধ্বনি প্রবাহিত হয়ে আসে—সম্পূর্ণ অপরিচিত ঘরের একটুখানি বার্তা পাওয়া যায়। মানুষ যখন বুঝতে পারে 'আমার কাছে আমি যত বড়োই হই আমাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করতে পারি নে, অধিকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অনাত্মীয়, আমা-হীন'— তখন এই প্রকাণ্ড ঢিলে জগতের মধ্যে আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং একরকম পরিত্যক্ত এবং প্রান্তবর্তী ব'লে মনে হয়; তখনই মনের মধ্যে এইরকমের একটা ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হয়। তা ছাড়া এই উলুধ্বনিতে নিজের অতীত ভবিষ্যৎ সমস্ত জীবনটা একটি অতি সুদীর্ঘ পথের মতো চোখের সমুখে উদয় হল এবং তারই এক-একটি সুদূর ছায়াময় প্রান্ত থেকে এই উলুধ্বনি কানে এসে পৌঁছতে লাগল। এইরকম ভাবে তো আজ দিনটা আরম্ভ করেছি। এখনই সদর নায়েব, আমলাবর্গ এবং প্রজারা উপস্থিত হলে এই উলুধ্বনির প্রতিধ্বনিটুকু পাড়া ছেড়ে পালাবে; অতি ক্ষীণ ভূতভবিষ্যৎকে দুই কনুই দিয়ে ঠেলে ফেলে জোয়ান বর্তমান নিজ মূর্তি ধরে সেলাম ঠুকে এসে দাঁড়াবে।

সাজাদপুর

২৮ জুন ১৮৯২

আজকের চিঠির মধ্যে এক জায়গায় অ—র গানের একটুখানি উল্লেখ আছে। পড়ে মনটা কেমন হঠাৎ হুহু করে উঠল। জীবনের অনেকগুলি ছোটো ছোটো উপেক্ষিত সুখ, যারা শহরের গোলমালের মধ্যে কোনো আমল পায় না, বিদেশে এলে তারা সময় বুঝে হৃদয়ের কাছে আপন আপন দরখাস্ত পাঠিয়ে দেয়। আমি গান বাজনা এত ভালোবাসি, এবং শহরেও এত কণ্ঠ এবং বাদ্য আছে, কিন্তু দিনের পর দিন চলে যায়, একদিনও কর্ণপাত করি নে। যদিও সব সময়ে বুঝতে পারি নে, কিন্তু মনের ভিতরটা কি তৃষিত হয়ে থাকে না? আজকের চিঠি পড়বা মাত্রই অ—র মিষ্টি গান শোনবার জন্যে আমার এমনি ইচ্ছে করে উঠল যে তখনই বুঝতে পারলুম, আমার প্রকৃতির অনেকগুলি ক্রন্দনের মধ্যে এও একটা ক্রন্দন ভিতরে ভিতরে চাপা ছিল। বড়ো বড়ো দুরাশার মোহে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে কী উপবাসী করেই রাখি! যখন বিলেতে যাচ্ছিলুম আমার একটা কল্পনার সুখের ছবি এই ছিল যে, কেউ একজন পিয়ানো বাজাচ্ছে, খোলা দরজা-জানলার ভিতর দিয়ে আলো এবং বাতাস আসছে, খানিকটা সুদূর আকাশ ও গাছপালা দেখা যাচ্ছে, আমি খোলা জানলার কাছে কৌচের উপর পড়ে বাইরে চোখ রেখে শুনছি। এটা যে একটা দুর্লভ দুরাশা তা বলতে পারি নে, কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে ক'দিন অদৃষ্টে এ সুখ পাওয়া যায়। এই-সমস্ত সুলভ আনন্দের অপরিতৃপ্তি জীবনের হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠছে, এর পরে এমন একটা

দিন আসতেও পারে যখন মনে হবে, যদি আবার জীবনটা সমস্তটা ফিরে পাই তা হলে আর কিছু অসাধ্য সাধন করতে চাই নে, কেবল জীবনের এই প্রতিদিনের অযাচিত ছোটো ছোটো আনন্দগুলি প্রতিদিন উপভোগ করে নিই।

৫৯

সাজাদপুর

সোমবার। ২৭ জুন ১৮৯২

কাল বিকেলের দিকে এমনি ক'রে এল, আমার ভয় হল। এমনতরো রাগী চেহারার মেঘ আমি কখনও দেখেছি ব'লে মনে হয় না। গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একেবারে থাকে থাকে ফুলে উঠেছে, একটা প্রকাণ্ড হিংস্র দৈত্যের রোষস্ফীত গোঁফ-জোড়াটার মতো। এই ঘন নীলের ঠিক পাশেই দিগন্তের সব শেষে ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে একটা টক্‌টকে রক্তবর্ণ আভা বেরোচ্ছে— একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক 'বাইসন' মোষ যেন খেপে উঠে রাঙা চোখ দুটো পাকিয়ে ঘাড়ের নীল কেশরগুলো ফুলিয়ে বক্র ভাবে মাথাটা নিচু ক'রে দাঁড়িয়েছে; এখনই পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ ক'রে দেবে— এবং এই আসন্ন সংকটের সময় পৃথিবীর সমস্ত শস্যখেত এবং গাছের পাতা হী হী করছে, জলের উপরিভাগ শিউরে শিউরে উঠছে, কাকগুলো অশান্ত ভাবে উড়ে উড়ে কা কা ক'রে ডাকছে।

সাজাদপুর
২৯ জুন ১৮৯২

কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম, আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেন্ট্ করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে, বইখানি হাতে, যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্ট্‌মাস্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোস্ট্‌মাস্টারের দাবি ঢের বেশি। আমি তাঁকে বলতে পারলুম না, 'আপনি এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।' বললেও সে লোকটি ভালো বুঝতে পারতেন না। অতএব পোস্ট্‌মাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হল। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট্ অপিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনই আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতালায় বসে সেই পোস্ট্‌মাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম। এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোস্ট্‌মাস্টারবাবু তার উল্লেখ ক'রে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প ক'রে যান, আমি চুপ ক'রে বসে শুনি। ওরই মধ্যে ওঁর আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে।

পোস্ট্‌মাস্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়ছিলুম। সভায় সিংহাসনের উপর সারি সারি সুসজ্জিত সুন্দর-চেহারা রাজারা ব'সে গেছেন, এমন

সময় শঙ্খ এবং তূরীধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ প'রে সুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মাঝখানে সভাপথে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এমনি সুন্দর লাগে। তার পরে সুনন্দা এক এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক-একটি প্রণাম ক'রে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম-করাটি কেমন সুন্দর। যাকে ত্যাগ করছেন তাকে যে নম্র ভাবে সম্মান ক'রে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে। সকলেই রাজা, সকলেই তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে এই অবশ্য-রূঢ়তা'টুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না।

সাজাদপুর
৩ জুলাই ১৮৯২

কাল রাত্রে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথায় এক জায়গায় লেপ্টেনাণ্ট্ গবর্নর এসেছেন এবং তাঁর অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে উৎসব হচ্ছে। অন্যান্য নানারকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বুতে একজন বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে গান গাচ্ছে। গাইয়ে একটা বড়োরকম ইমনকল্যাণ গাচ্ছিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে— তার পর তৃতীয়বারের বার নিরাশ হয়ে গানের কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ সেই সুরটা কেমন ক'রে কান্নায় পরিবর্তিত হয়ে গেল— সবাই মনে করছিল, সে গান গাচ্ছে, হঠাৎ দেখে সে কান্না। তার কান্না শুনে বড়দাদা 'আহা' 'আহা' করে উঠলেন। একজন প্রকৃত গুণীর মনে এরকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগতে পারে, তিনি যেন সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। তার পরে নানারকম অসংলগ্ন হিজিবিজি কী হল এবং বাংলা মুল্লুকের লেপ্টেনাণ্ট্ গবর্নর যে কোথায় উড়ে গেলেন তার কিছুই মনে নেই।

শিলাইদহ
২০ জুলাই ১৮৯২

আজ এইমাত্র প্রাণটা যাবার জো হয়েছিল। পান্টি থেকে শিলাইদহে যাচ্ছিলুম, বেশ পাল পেয়েছিলুম, খুব হুহুঃ শব্দে চলে আসছিলুম। বর্ষার নদী চার দিকে থই থই করছে, এবং হৈ হৈ শব্দে ঢেউ উঠছে, আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি এবং মাঝে মাঝে লেখাপড়া করছি। বেলা সাড়ে দশটার সময় গড়ুই নদীর ব্রীজ দেখা গেল। বোটের মাস্তুল ব্রিজে বাধবে কি না তাই নিয়ে মাঝিদের মধ্যে তর্ক পড়ে গেল— ইতিমধ্যে বোট ব্রিজের অভিমুখে চলেছে। মাঝিদের আশা ছিল যে আমরা স্রোতের বিপরীত মুখে যখন চলেছি তখন ভাবনা নেই— কারণ, ব্রিজের কাছাকাছি এসেও যদি দেখা যায় যে মাস্তুল বাধবে তখনই পাল নাবিয়ে দিলে বোট স্রোতে পিছিয়ে যাবে। কিন্তু ব্রিজের কাছে এসে আবিষ্কার করা গেল মাস্তুল ঠেকবে এবং সেখানে একটা আওড় (আবর্ত) আছে। সেই আওড় থাকাতে সেখানে স্রোতের গতি বিপরীত মুখে হয়েছে। তখন বোঝা গেল সামনে একটি বিপদ উপস্থিত, কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করবার সময় ছিল না, দেখতে দেখতে বোট ব্রিজের উপর গিয়ে পড়ল। মাস্তুল মড়্‌মড়্‌ ক'রে ক্রমেই কাত হতে লাগল, আমি হতবুদ্ধি মাল্লাদের ক্রমাগত বলছি 'তোরা ওখান থেকে সর, মাথায় মাস্তুল ভেঙে মরবি না কি!' এমন সময় আর-একটা নৌকো তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে এসে আমাকে তুলে নিলে এবং রসি নিয়ে আমার বোটটাকে টানতে লাগল। তপ্‌সি এবং আর-একজন মাল্লা রসি দাঁতে কামড়ে সাঁৎরে ডাঙায় উঠে টানতে লাগল; সেখানে আরও অনেক লোক জমা হয়ে বোট টেনে তুললে। সকলে ডাঙায়

ভিড় করে এসে বললে, 'আল্লা বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নইলে বাঁচবার কোনো কথা ছিল না।' সমস্তই জড়পদার্থের কাণ্ড কিনা— আমরা হাজার কাতর হই, চেঁচাই, লোহাতে যখন কাঠ ঠেকল এবং নীচের থেকে যখন জল ঠেলতে লাগল, তখন যা হবার তা হবেই। জলও এক মুহূর্ত থামল না, মাস্তুলও এক চুল মাথা নিচু করল না, লোহার ব্রিজও যেমন তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

শিলাইদহ

২১ জুলাই ১৮৯২

কাল বিকেলে শিলাইদহে পৌঁচেছিলুম, আজ সকালে আবার পাবনায় চলেছি। নদীর যে রোখ! যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো। গতিগর্বে ঢেউ তুলে ফুলে ফুলে চলেছে— এই খেপা নদীর উপর চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি। এর মধ্যে ভারি একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে আর কী বলব। ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করে কিছুতে যেন আর ক্ষান্ত হতে পারছে না, ভারি একটা যৌবনের মত্ততার ভাব। এ তবু গড়ুই নদী, এখান থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে, তার বোধ হয় আর কূল-কিনারা দেখবার জো নেই। সে মেয়ে বোধ হয় একেবারে উন্মাদ হয়ে খেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, সে আর কিছুর মধ্যেই থাকতে চায় না। তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্তি মনে হয়— নৃত্য করছে, ভাঙছে, এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝিরা বলছিল, নতুন বর্ষায় পদ্মার খুব 'ধার' হয়েছে। ধার কথাটা ঠিক। তীব্র স্রোত যেন চক্‌চকে খড়্গের মতো, পাৎলা ইস্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়— প্রাচীন ব্রিটনদের যুদ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাঁধা— দুই ধারের তীর একেবারে অবহেলে ছারখার করে দিয়ে চলেছে।

কাল যে কাণ্ডটি হয়েছিল সে কিছু গুরুতর বটে। কাল যম-রাজের সঙ্গে একরকম হাউ-ডু-ডু করে আসা গেছে। মৃত্যু যে ঠিক আমাদের নেক্স্‌ট্‌-ডোর নেবার, তা এরকম ঘটনা না হলে সহজে মনে হয় না। হয়েও বড়ো মনে পড়ে না। কাল চকিতের মতো যাঁর আভাস পাওয়া গিয়েছিল আজ তাঁর মূর্তিখানা কিছুই স্মরণ হচ্ছে

না। অপ্রিয় অনাবশ্যক বন্ধুর মতো একেবারে অনাহূত ঘাড়ে এসে না পড়লে তাঁর বিষয়ে আমরা বড়ো একটা ভাবি নে। যদিও তিনি আড়াল থেকে আমাদের সর্বদাই খোঁজখবর নিয়ে থাকেন। যা হোক, তাঁকে আমি বহুত বহুত সেলাম দিয়ে জানিয়ে রাখছি, তাঁকে আমি এক কানা কড়ির কেয়ার করি নে, তা তিনি জলে ঢেউই তুলুন আর আকাশ থেকে ফুঁ'ই দিন— আমি আমার পাল তুলে চললুম। তিনি যতদূর করতে পারেন তা পৃথিবীসুদ্ধ সকলেরই জানা আছে, তার বেশি আর কী করবেন! যেম্‌নি হোক, হাঁউমাউ করব না।

শিলাইদহ
২০ অগস্ট ১৮৯২

রোজ সকালে চোখ চেয়েই আমার বাঁ দিকে জল এবং ডান দিকে নদীতীর সূর্যকিরণে প্লাবিত দেখতে পাই। অনেক সময়ে ছবি দেখলে যে মনে হয় 'আহা, এইখানে যদি থাকতুম', ঠিক সেই ইচ্ছাটা এখানে পরিতৃপ্ত হয়; মনে হয়, একটি জাজ্বল্যমান ছবির মধ্যে আমি বাস করছি, বাস্তব জগতের কোনো কঠিনতাই এখানে যেন নেই। ছেলেবেলায় রবিন্‌সন্‌ক্রুসো পৌলবর্জিনি প্রভৃতি বই থেকে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারি উদাসীন হয়ে যেত— এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি ভারি জেগে ওঠে। এর যে কী মানে ঠিক ধরতে পারি নে, এর সঙ্গে যে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে ঠিক বুঝতে পারি নে। এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম— তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই-যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতি-নিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং

গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে-একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে— কিন্তু ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না, কী একটা কিম্ভূত রকমের মনে করবে।

৬৫

বোয়ালিয়া

১৮ নভেম্বর ১৮৯২

ভাবছিলুম এতক্ষণে রেলগাড়ি না জানি কোথায় গিয়ে পৌঁছল। এই সময়টা সকালবেলায় নওয়াড়ির কাছে উঁচুনিচু প্রস্তরকঠিন তরু-বিরল পৃথিবীর উপর সূর্যোদয় হয়। বোধ হয় নবীন রৌদ্রে এতক্ষণে চারি দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে আকাশপটে নীল পর্বতের আভাস দেখা যাচ্ছে, শস্যক্ষেত্র বড়ো একটা নেই, দৈবাৎ দুই-এক জায়গায় সেখানকার বুনো চাষারা মহিষ নিয়ে চাষ আরম্ভ করেছে ; দুই ধারে বিদীর্ণ পৃথিবী, কালো কালো পাথর, শুকনো জলস্রোতের নুড়ি-ছড়ানো পথচিহ্ন, ছোটো ছোটো অপরিণত শালগাছ, এবং টেলিগ্রাফের তারের উপর কালো লেজ-ঝোলানো চঞ্চল ফিঙে পাখি। একটা যেন বৃহৎ বন্য প্রকৃতি পোষ মেনে একটি জ্যোতির্ময় নবীন দেবশিশুর উজ্জ্বল কোমল করস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করে শান্ত স্থির ভাবে শুয়ে পড়ে আছে। কিরকম ছবিটা আমার মনে আসে বলব ? কালিদাসের শকুন্তলায় আছে দুষ্যন্তের ছেলে শিশু ভরত একটা সিংহশাবক নিয়ে খেলা করত। সে যেন একদিন পশুবৎসলভাবে সিংহশাবকের বড়ো বড়ো রোঁওয়ার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে আপনার শুভ্রকোমল অঙ্গুলিগুলি চালনা করছে, আর বৃহৎ জন্তুটা স্থির হয়ে পড়ে আছে, এবং মাঝে মাঝে সস্নেহে একান্ত নির্ভরের ভাবে আপনার মানববন্ধুর প্রতি আড়চক্ষে চেয়ে দেখছে। আর ওই-যে শুকনো স্রোতের নুড়ি-ছড়ানো পথের কথা বললুম, ওতে আমার কী মনে পড়ে বলব ? বিলিতি রূপকথায় পড়া যায়, বিমাতা যখন তার সতিনের ছেলেমেয়েকে ঘর থেকে তাড়িয়ে ছল করে একটা অচেনা অরণ্যের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে, তখন দুই

ভাইবোনে বনের ভিতর চলতে চলতে বুদ্ধিপূর্বক একটা একটা নুড়ি ফেলে আপনাদের পথ চিহ্নিত করে গিয়েছিল। ছোটো ছোটো স্রোতগুলি যেন সেইরকম ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, তারা খুব তরুণ শৈশবে এই অচেনা বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে বেরিয়ে পড়ে; তাই চলতে চলতে আপনাদের পথের উপর ছোটো ছোটো নুড়ি ছড়িয়ে রেখে যায়, আবার যদি ফিরে আসে আপনার এই গৃহপথটি ফিরে পাবে। কিন্তু ফিরে আসা আর ঘটবে না।

নাটোর
২ ডিসেম্বর ১৮৯২

কাল ম—র ওখানে গিয়েছিলুম। বিকেলে সকলে মিলে বেড়াতে গেলুম। দুই ধারে মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা আমার বেশ লেগেছিল। বাংলাদেশের ধুধু জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সূর্যাস্ত— কী-একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা। আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহু-দূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী একটা স্নেহভারবিনত মৌন ম্লান মিলন। অনন্তের মধ্যে যে-একটি প্রকাণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধেবেলাকার পরিত্যক্তা পৃথিবীর উপরে কী-একটি উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়, সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী-একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা। অনেক ক্ষণ চুপ করে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়, যদি এই চরাচরব্যাপ্ত নীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, তা হলে কী-একটা গভীর গম্ভীর শান্তসুন্দর সকরুণ সংগীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে। আসলে তাই হচ্ছে। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎব্যাপী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম কম্পনধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়। কিন্তু আমি এই সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের কথা কতবার লিখব। নিত্য নূতন করে অনুভব করা যায়, কিন্তু নিত্য নূতন করে প্রকাশ করি কী করে।

শিলাইদহ

৯ ডিসেম্বর ১৮৯২

এখন একলাটি আমার সেই বোটের জানলার কাছে অধিষ্ঠিত হয়ে বহু দিন পরে একটু মনের শান্তি পেয়েছি। স্রোতের অনুকূলে বোট চলছে, তার উপর পাল পেয়েছে; দুপুরবেলাকার রোদ্দুরে শীতের দিনটা ঈষৎ তেতে উঠেছে; পদ্মায় নৌকো নেই; শূন্য বালির চর হলদে রঙ, এক দিকে নদীর নীল আর-এক দিকে আকাশের নীলের মাঝে একটি রেখার মতো আঁকা রয়েছে— জল কেবল উত্তরে বাতাসে খুব অল্প অল্প চিক্‌চিক্‌ করে কাঁপছে, ঢেউ নেই। আমি এই খোলা জানলার ধারে হেলান দিয়ে বসে আছি; আমার মাথায় অল্প অল্প বাতাস লাগছে, বেশ আরাম করছে। অনেক দিন তীব্র রোগভোগের পর শরীরটা শিথিল দুর্বল অবস্থায় আছে, এইরকম সময় প্রকৃতির এই ধীর স্নিগ্ধ শুশ্রূষা ভারি মধুর লাগছে। এই শীতশীর্ণ নদীর মতো আমার সমস্ত অস্তিত্ব যেন মৃদু রৌদ্রে প'ড়ে অলসভাবে ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে, এবং যেন অর্ধেক আনমনে চিঠি লিখে যাচ্ছি। প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয়, আমার পদ্মা বোধ হয় পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু, যখনই বোট ভাসিয়ে দিই, চারি দিকে জল কুল্‌কুল্‌ করে ওঠে— চারি দিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদু কলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য-উৎসব উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়। এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর

এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত ক'রে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা [illegible] পুলকে নীলাম্বর-তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল' প'রে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে, কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছি— বহুসন্তানবতী মা যেমন অর্ধ-মনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণু ভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন, আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না; আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকে যাচ্ছি। এই ভাবে একরকম কেটে যাচ্ছে। প্রায় বিকেল হয়ে এল। এখন শীতের বেলা কিনা, দেখতে দেখতে রোদ্দুর পড়ে যায়।

কটক
ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

আমি তো বলি, যত দিন না আমরা একটা-কিছু করে তুলতে পারব তত দিন আমাদের অজ্ঞাতবাস ভালো। কেননা, আমরা যখন সত্যই অবমাননার যোগ্য তখন কিসের দোহাই দিয়ে পরের কাছে আত্মসম্মান রক্ষা করব? পৃথিবীর মধ্যে যখন আমাদের একটা-কোনো প্রতিষ্ঠাভূমি হবে, পৃথিবীর কাজে যখন আমাদের একটা-কোনো হাত থাকবে, তখন আমরা ওদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইতে পারব। তত দিন লুকিয়ে থেকে চুপ মেরে আপনার কাজ করে যাওয়াই ভালো। দেশের লোকের ঠিক এর উল্টো ধারণা। যা-কিছু ভিতরকার কাজ, যা গোপনে থেকে করতে হবে, সে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে; যেটা নিতান্ত অস্থায়ী আস্ফালন এবং আড়ম্বর মাত্র সেইটেতেই তাদের যত ঝোঁক। আমাদের এ বড়ো হতভাগা দেশ। এখানে মনের মধ্যে কাজ করবার বল রাখা বড়ো শক্ত। যথার্থ সাহায্য করবার লোক কেউ নেই। যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে প্রাণ সঞ্চয় করা যায় এমন মানুষ দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি পাওয়া যায় না। কেউ চিন্তা করে না, অনুভব করে না, কাজ করে না; বৃহৎ কার্যের, যথার্থ জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা কারও নেই; বেশ একটি পরিণত মনুষ্যত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। সমস্ত মানুষগুলো যেন উপছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে, আপিস যাচ্ছে, ঘুমচ্ছে, তামাক টানছে, আর নিতান্ত নির্বোধের মতো বকর্ বকর্ বকছে। যখন ভাবের কথা বলে তখন সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ে, আর যখন যুক্তির কথা পাড়ে তখন ছেলেমানুষি করে। যথার্থ মানুষের সংস্রব পাবার জন্যে মানুষের মনে ভারী একটা তৃষ্ণা থাকে। কিন্তু সত্যকার রক্তমাংসের শক্তসমর্থ মানুষ তো নেই— সমস্ত উপছায়া, পৃথিবীর সঙ্গে অসংলগ্নভাবে বাষ্পের মতো ভাসছে।

বালিয়া

মঙ্গলবার। ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

আমার কিন্তু আর ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করছে না। ভারী ইচ্ছে করছে, একটি কোণের মধ্যে আড্ডা করে একটু নিরিবিলি হয়ে বসি। ভারতবর্ষের দুটি অংশ আছে— এক অংশ গৃহস্থ, আর-এক অংশ সন্ন্যাসী; কেউ বা ঘরের কোণ থেকে নড়ে না, কেউ বা একেবারে গৃহহীন। আমার মধ্যে ভারতবর্ষের সেই দুই ভাগই আছে। ঘরের কোণও আমাকে টানে, ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে। খুব ভ্রমণ করে দেখে বেড়াব ইচ্ছে করে, আবার উদ্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত মন একটি নীড়ের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে। পাখির মতো ভাব আর-কি। থাকবার জন্যে যেমন ছোট্টো নীড়টি, ওড়বার জন্যে তেমনি মস্ত আকাশ। আমি যে কোণটি ভালোবাসি সে কেবল মনকে শান্ত করবার জন্যে। আমার মনটা ভিতরে ভিতরে এমনি অশ্রান্ত ভাবে কাজ করতে চায়, লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তার কর্মোদ্যম এমনি পদে পদে প্রতিহত হতে থাকে, যে, সে অস্থির হয়ে ওঠে— খাঁচার ভিতর থেকে আমাকে কেবলই যেন আঘাত করে। একটু নিরালা পেলে সে বেশ সাধ মিটিয়ে ভাবতে পারে, চারি দিকে চেয়ে দেখতে পারে, ভাবগুলিকে মনের মতো করে প্রকাশ করতে পারে। দিবারাত্রি সে অখণ্ড অবসর চায়— সৃষ্টিকর্তা আপনার সৃষ্টির মধ্যে যেমন একাকী, সে আপনার ভাবরাজ্যের মধ্যখানে তেমনি একলা বিরাজ করতে চায়।

কটক

১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

এখানকার একটা উৎকট ইংরেজ, প্রকাণ্ড নাক, ধূর্ত চোখ, দেড়হাত চিবুক, গোঁফদাড়ি কামানো, মোটা গলা, একটা পূর্ণপরিণত জনবুষ। গবর্মেণ্ট আমাদের দেশের জুরিপ্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল বলে চার দিকে একটা আপত্তি উঠেছে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ে কথা তুলে ব—বাবুর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। বললে, এ দেশের moral standard low, এখানকার লোকের lifeএর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যোগ্য নয়। একজন বাঙালির নিমন্ত্রণে এসে বাঙালির মধ্যে বসে যারা এরকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না, তারা আমাদের কী চক্ষে দেখে! খাবার টেবিল থেকে যখন ড্রয়িংরুমের এক কোণে এসে বসলুম, আমার চোখে সমস্ত ছায়ার মতো ঠেকছিল। আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিলুম, আমাদের এই গৌরবহীন বিষণ্ণ জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসেছিলুম— এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কী বলব। অথচ চোখের সামনে ঈভ্‌নিংড্রেস-পরা মেমসাহেব, এবং কানের কাছে ইংরেজি হাস্যালাপের গুঞ্জনধ্বনি— সবসুদ্ধ এমনি অসংগত! আমাদের চিরকালের ভারতবর্ষ আমার কাছে কতখানি সত্য— আর এই ডিনার-টেবিলের বিলিতি মিষ্টহাসি, ইংরিজি শিষ্টালাপ আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি!

পুরী

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

কারও কারও মন ফোটোগ্রাফের wet plateএর মতো, যে ছবিটা ওঠে সেটাকে তখনই ফুটিয়ে কাগজে না ছাপিয়ে নিলে নষ্ট হয়ে যায়। আমার মন সেই জাতের। যখন যে-কোনো ছবি দেখি অমনি মনে করি এটা চিঠিতে ভালো করে লিখতে হবে। কটক থেকে পুরী পর্যন্ত এলুম, এই ভ্রমণের কত কী বর্ণনা করবার আছে তার ঠিক নেই। যেদিন যা দেখছি সেইদিনই সেইগুলো লেখবার যদি সময় পেতুম তা হলে ছবি বেশ ফুটে উঠতে পারত; কিন্তু মাঝে দুই-এক দিন গোলেমালে কেটে গেল, ইতিমধ্যে ছবির খুঁটিনাটি রেখাগুলি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তার একটা প্রধান কারণ, পুরীতে এসে পৌঁছে সামনে অহর্নিশি সমুদ্র দেখছি, সেই আমার সমস্ত মন হরণ করেছে, আমাদের দীর্ঘ ভ্রমণপথের দিকে পশ্চাৎ ফিরে চাইবার আর অবসর পাওয়া যাচ্ছে না।

শনিবার মধ্যাহ্নে আহারাদি করে বলু, আমি, বি—বাবু, একটি ভাড়াটে ফিটন গাড়িতে আমাদের কম্বল-বিছানা পেতে তিনটি পিঠের কাছে তিন বালিশ রেখে কোচ্‌বাক্সে একটি চাপরাশি চড়িয়ে যাত্রা আরম্ভ করে দিলুম।

কাঠজুড়ি পেরিয়ে আমাদের পথ। সেখানে গাড়ি থেকে নেবে আমাদের পাল্কিতে উঠতে হল। ধূসর বালুকা ধূধূ করছে। ইংরেজিতে একে যে নদীর বিছানা বলে— বিছানাই বটে। সকালবেলাকার পরিত্যক্ত বিছানার মতো— নদীর স্রোত যেখানে যেমন পাশ ফিরে-ছিল, যেখানে যেমন তার ভার দিয়েছিল, তার বালুশয্যায় সেখানে তেমনি উঁচু-নিচু হয়ে আছে, সেই বিশৃঙ্খল শয়ন কেউ আর যত্ন করে

হাত দিয়ে সমান করে বিছিয়ে রাখে নি। এই বিস্তীর্ণ বালির ও পারে একটি প্রান্তে একটুখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণস্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহিণীর বর্ণনায় আছে যে, যক্ষপত্নী বিরহশয়নের একটি প্রান্তে লীন হয়ে আছে, যেন পূর্বদিকের শেষ সীমায় কৃষ্ণপক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মতো। কালিদাসের এই নদীটুকু দেখে বিরহিণীর যেন আর-একটি উপমা পাওয়া গেল।

কটক থেকে পুরী পর্যন্ত পথটি খুব ভালো। পথ উচ্চে, তার দুই ধারে নিম্নক্ষেত্র। বড়ো বড়ো গাছে ছায়াময়। অধিকাংশ আমগাছ। এই সময়ে সমস্ত আমগাছে মুকুল ধরেছে, গন্ধে পথ আকুল হয়ে আছে। আম অশ্বত্থ বট নারিকেল এবং খেজুর গাছে ঘেরা এক-একটি গ্রাম দেখা যাচ্ছে। কোথাও বা স্বল্পজলা নদীর তীরে ছাপরওয়ালা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গোলপাতার ছাউনির নীচে মেঠাইয়ের দোকান বসেছে; পথের ধারে গাছের তলায় এবং শ্রেণীবদ্ধ কুঁড়েঘরের মধ্যে যাত্রীরা খাওয়াদাওয়া করছে; ভিক্ষুকের দল নতুন যাত্রী ও গাড়ি পাল্কি দেখবামাত্র বিচিত্র কণ্ঠে ও ভাষায় আর্তনাদ করতে আরম্ভ করছে।

যত পুরীর নিকটবর্তী হচ্ছি তত পথের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা গোরুর গাড়ি সারি সারি চলেছে। রাস্তার ধারে, গাছের তলায়, পুকুরের পাড়ে লোক শুয়ে আছে, রাঁধছে, জটলা করে রয়েছে। মাঝে মাঝে মন্দির, পান্থশালা, বড়ো বড়ো পুষ্করিণী। পথের ডান দিকে একটা খুব মস্ত বিলের মতো— তার ও পারে পশ্চিমে গাছের মাথার উপর জগন্নাথের মন্দিরচূড়া দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এক জায়গায় গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েই সুবিস্তীর্ণ বালির তীর এবং ঘন নীল সমুদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল।

৭২

পুরী

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

তাঁর কবিতা যে খারাপ তা নয়, কেবল চলনসই মাত্র। কেউ কেউ যেমন প্রথম শ্রেণীতে পাস করে, কেউ কেউ তেমনি প্রথম শ্রেণীতে ফেল করে। কিন্তু যারা পাস করে তাদেরই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্দিষ্ট হয়, যারা ফেল করে তারা সবাই এক দলের মধ্যে পড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যেমন অনেক ভালো ছেলে অঙ্কে ফেল, তেমনি কাব্যে যারা ফেল তারা অনেকেই সংগীতে ফেল। তাদের ভাব আছে, কথা আছে, রকম-সকম আছে, আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই, কেবল সেই সংগীতটি নেই যাতে মুহূর্তে সমস্তটি কবিতা হয়ে ওঠে। সেইটেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া ভারী শক্ত। কাঠও আছে, ফুঁও আছে, কেবল সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গটুকু মাত্র নেই যাতে সবটা ধ'রে উঠে আগুন হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কাঠের বোঝাটা নানা স্থান থেকে পরিশ্রমপূর্বক সংগ্রহ করে আনা যায়, কিন্তু সেই অগ্নিকণাটুকু নিজের অন্তরের মধ্যে আছে—সেটুকু না থাকলে পর্বতপ্রমাণ স্তূপ ব্যর্থ হয়ে যায়।

৭৩

বালিয়া

১১ মার্চ ১৮৯৩

ছোট্টো বোটখানি। আমার মতো লম্বা লোকের দৈর্ঘ্যগর্ব খর্ব করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি। ভ্রমক্রমে মাথা একটু-খানি তুলতে গেলেই অমনি কাষ্ঠফলকের প্রচণ্ড চপেটাঘাত মাথার উপর এসে পড়ে— হঠাৎ একেবারে দমে যেতে হয়; সেইজন্যে কাল থেকে নতশিরে যাপন করছি। কপালে যত দুঃখ যত ব্যথা ছিল তার উপরে আবার প্রত্যেকবার দাঁড়াতে গিয়ে নতুন ব্যথা বাড়ছে। সেজন্যে তত আপত্তি করি নে; কিন্তু কাল মশার জ্বালায় ঘুম হয় নি, সেটা আমার অন্যায় মনে হচ্ছে।

এ দিকে আবার শীত কেটে গিয়ে গরম পড়ে এসেছে; রৌদ্র উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং পাশের জানলা দিয়ে মন্দ মন্দ সজল শীতল বাতাস পিঠের উপর এসে লাগছে। আজ আর শীত কিম্বা সভ্যতার কোনো খাতির নেই— বনাতের চাপকান চোগা হুকের উপর উদ্‌বন্ধনে ঝুলছে। ঘণ্টাও বাজছে না, সসজ্জ খানসামা এসেও সেলাম করছে না— অসভ্যতার অপরিচ্ছন্ন শৈথিল্য ও আরাম উপভোগ করছি। পাখিগুলো ডাকছে এবং তীরে দুটো বড়ো বড়ো বটগাছের পাতা বাতাসে ঝর্ ঝর্ করে শব্দ করছে— কম্পিত জলের উপরকার রৌদ্রালোক বোটের ভিতরে এসে ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে— বেলাটা এক-রকম ঢিলে ভাবেই চলেছে। কটকে থাকতে ছেলেদের ইস্কুল ও বি—বাবুর আদালতে যাবার তাড়া দেখে সময়ের দুর্‌মূল্যতা এবং সভ্য মানবসমাজের ব্যস্ততা খুব অনুভব করা যেত। এখানে সময়ের ছোটো ছোটো নির্দিষ্ট সীমা নেই, কেবল দিন এবং রাত্রি এই দুটি বড়ো বড়ো বিভাগ।

তীরন

মার্চ ১৮৯৩

এই মেঘবৃষ্টি পাকা কোঠার মধ্যে অতি ভালো, কিন্তু ছোট্টো বোটটির মধ্যে দুটি রুদ্ধ প্রাণীর পক্ষে মনোরম নয়। একে তো উঠতে-বসতে মাথা ঠেকে, তার উপরে আবার যদি মাথায় জল পড়তে থাকে, তা হলে বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হতেও পারে, কিন্তু আমার 'দুর্দশার পেয়ালা' একেবারে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে করে-ছিলুম বৃষ্টি বাদলা এক-রকম ফুরোল, এখন স্নাত পৃথিবীসুন্দরী কিছুদিন রৌদ্রে পিঠ দিয়ে আপনার ভিজে এলোচুল শুকোবে, আপনার সিক্ত সবুজ শাড়িখানি রৌদ্রে গাছের ডালে টাঙিয়ে দেবে, মাঠের মধ্যে মেলে দেবে— বসন্তী আঁচলখানি শুকিয়ে ফুর্‌ফুরে হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। কিন্তু রকমটা এখনও সে ভাবের নয়— বাদলার পর বাদলা, এর আর বিরাম নেই। আমি তো দেখে-শুনে এই ফাল্গুন মাসের শেষভাগে কটকের এক ব্যক্তির একখানি মেঘদূত ধার করে নিয়ে এসেছি। আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠির সম্মুখবর্তী অবারিত শস্য-ক্ষেত্রের উপরে আকাশ যেদিন আর্দ্রস্নিগ্ধ সুনীলবর্ণ হয়ে উঠবে সেদিন বারান্দায় বসে আবৃত্তি করা যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কিছুই মুখস্থ হয় না— কবিতা ঠিক উপযুক্ত সময়ে মুখস্থ আবৃত্তি করে যাওয়া একটা পরম সুখ, সেটা আমার অদৃষ্টে নেই। যখন আবশ্যক হয় তখন বই হাৎড়ে সন্ধান করে পড়তে গিয়ে আবশ্যক ফুরিয়ে যায়। মনে করো, মনে ব্যথা লেগে ভারী কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছে, তখন যদি দরোয়ান পাঠিয়ে বাথ্‌গেটের বাড়ি থেকে শিশি করে চোখের জল আনতে হত, তা হলে কী মুশকিলই হত। এইজন্যে মফস্বলে যখন

যাই তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়; তার সবগুলোই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়; কিন্তু কখন্ কোন্‌টা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়। মানুষের মনের যদি নির্দিষ্ট ঋতুভেদ থাকত তা হলে অনেক সুবিধে হত। যেমন শীতের সময় কেবল শীতের কাপড় নিয়ে যাই এবং গরমের সময় বালাপোষ নেবার কোনো দরকার থাকে না, তেমনি যদি জানতুম মনে কখন শীত কখন বসন্ত আসবে তা হলে আগে থাকতে সেইরকম গদ্য কিম্বা পদ্যের যোগাড় করা যেতে পারত। কিন্তু মনের ঋতু আবার ছ'টা নয়, একেবারে বাহান্নটা— এক প্যাকেট তাসের মতো— কখন্ কোন্‌টা হাতে আসে তার কিছু ঠিক নেই— অন্তরে বসে বসে কোন্ খামখেয়ালী খেলোয়াড় যে এই তাস ডীল্ ক'রে এই খামখেয়ালী খেলা খেলে তার পরিচয় জানি নে। সেই জন্য মানুষের আয়োজনের শেষ নেই— তাকে যে কত রকমের কত-কী হাতে রাখতে হয় তার ঠিক নেই। সেই জন্যে আমার সঙ্গে 'নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর' থেকে আরম্ভ করে শেক্স্‌পীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই। এর মধ্যে অধিকাংশ বইই ছোঁব না, কিন্তু কখন্ কী আবশ্যক হবে বলা যায় না। অন্যবার বরাবর আমার বৈষ্ণব কবি এবং সংস্কৃত বই আনি; এবার আনি নি, সেই জন্যে ঐ দুটোরই প্রয়োজন বেশি অনুভব হচ্ছে। যখন পুরী খণ্ড-গিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত ভারী সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিল না, তার বদলে Caird's Philosophical Essays ছিল।

৭৫

কটক

মার্চ ১৮৯৩

তার পরে সাহেবের গান শুনলুম, সাহেবকে গান শোনালুম, তালি দিলুম এবং তালি পেলুম। এই-যে বাহবাটুকু পাওয়া যায়, এ কি যথার্থ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে? এ কি কতকটা কৌতূহল-পরিতৃপ্তি নয়? সত্যি কি আমার যা ভালো লাগে ওদের তাই ভালো লাগে? এবং ওদের যা ভালো লাগে না তাই বাস্তবিক ভালো নয়? তাই যদি না হয় তবে ঐ করতলের তালিতে আমার এতই কী সুখ হবে? ইংরেজের তালিকে যদি আমরা অতিরিক্ত মূল্য দিতে আরম্ভ করি তা হলে আমাদের দেশের অনেক ভালোকে ত্যাগ করতে হয় এবং ওদের দেশের অনেক মন্দকে গ্রহণ করতে হয়। তা হলে পায়ের মোজাটি খুলে বেরোতে আমাদের হয়তো লজ্জা হবে, কিন্তু ওদের নাচের কাপড় পরতে লজ্জা হবে না। আমাদের দেশের শিষ্টাচার সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করতে কিছুই সংকোচ হবে না এবং ওদের দেশের কোনো প্রচলিত অশিষ্টাচারও অম্লান-মুখে গ্রহণ করতে পারব। আমাদের দেশের আচকানকে সম্পূর্ণ মনের মতো ভালো দেখতে নয় ব'লে ত্যাগ করব, কিন্তু ওদের দেশের টুপিকে বদ দেখতে হলেও শিরোধার্য করব। আমরা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত-সারে ঐ করতালির নির্দেশমত আপনার জীবনকে গঠিত করতে থাকি এবং তাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করে ফেলি। আমি নিজেকে সম্বোধন করে বলি— 'হে মৃৎপাত্র, ঐ কাংস্যপাত্রের কাছ থেকে দূরে থেকো; ও যদি রাগ করে তোমাকে আঘাত করে তাতেও তুমি চূর্ণ হয়ে যাবে, আর ও যদি সোহাগ ক'রে তোমার পিঠে চাপড় মারে তাতেও তুমি ফুটো হয়ে অতলে মগ্ন হয়ে যাবে—

অতএব বৃদ্ধ ঈসপের উপদেশ শোনো, তফাৎ থাকাই সার কথা। উনি থাকুন বড়ো ঘরে, আর আমার সামান্য ঘরে সামান্য পাত্রের হয়তো ছোটোখাটো কাজ আছে— কিন্তু সে যদি আপনাকে ভেঙে ফেলে তবে তার বড়ো ঘরও নেই, ছোটো ঘরও নেই, তবে সে মাটির সমান হয়ে যাবে। তখন হয়তো আমাদের বড়ো-ঘর-ওয়ালা ব্যক্তিটি ঐ খণ্ড জিনিসকে তাঁর ড্রয়িংরুমের ক্যাবিনেটের এক পার্শ্বে সাজিয়ে রাখতে পারেন— সে কিন্তু ক্যুরিয়সিটির স্বরূপে— তার চেয়ে ক্ষুদ্র গ্রামের কুলবধূর কক্ষে বিরাজ করেও গৌরব আছে।'

কটক

মার্চ ১৮৯৩

এক-একজন লোক আছে যারা কোনো-কিছু না করলেও যেন আশাতীত ফল দান করে; সু— সেই দলের লোক। ও যে খুব পাশ করবে, প্রাইজ পাবে, লিখবে, বড়ো কাজ কিম্বা ভালো চাকরি করবে, তা যেন তেমন আবশ্যক মনে হয় না— মনে হয় যেন কিছু না করলেও ওর মধ্যে একটা চরিতার্থতা আছে। অধিকাংশ লোককেই অকর্মণ্য হয়ে থাকা শোভা পায় না, তাতে তাদের অপদার্থতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু সু— কিছুই না করলেও ওকে কেউ অযোগ্য ব'লে ঘৃণা করতে পারবে না। কাজকর্মের ব্যস্ততা মানুষের পক্ষে একটা আচ্ছাদনের মতো, সমস্ত কমন্‌প্লেস লোকের সেটা ভারী আবশ্যক— তাতে তাদের দৈন্য, তাদের শীর্ণতা ঢাকা পড়ে— কিন্তু যারা স্বভাবতই পরিপূর্ণ প্রকৃতির লোক তারা সমস্ত কর্মাবরণমুক্ত হলেও একটি শোভা এবং সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারে। সু—র মতন অমন ষোলো আনা শৈথিল্য আর-কোনো ছেলের দেখলে নিশ্চয় অসহ্য বোধ হত, কিন্তু সু—র কুঁড়েমিতে একটি মাধুর্য আছে। সে আমি ওকে ভালোবাসি ব'লে নয়— তার প্রধান কারণ হচ্ছে, চুপচাপ বসে থেকেও ওর মনটি বেশ পরিণত হয়ে উঠছে এবং ওর আত্মীয়স্বজনের প্রতি ওর কিছুমাত্র ঔদাসীন্য নেই। যে কুঁড়েমিতে মূঢ়তা এবং অন্যের প্রতি অবহেলা ক্রমাগত স্ফীত হয়ে গোলগাল তেল-চুক্‌চুকে হয়ে উঠতে থাকে সেইটেই যথার্থ ঘৃণ্য। সু— একটি সহৃদয় এবং সুবুদ্ধি আলস্যের দ্বারা যেন মধুররসসিক্ত হয়ে আছে। যে গাছে সুগন্ধ ফুল ফোটে সে গাছে আহার্য ফল না ধরলেও চলে। সু—কে

যে সকলে ভালোবাসে সে ওর কোনো কাজের দরুন, ক্ষমতার দরুন, চেষ্টার দরুন নয়— ওর প্রকৃতির অন্তর্গত একটি সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যের দরুন।

কলিকাতা

১৬ এপ্রিল ১৮৯৩

ভ্রমণের গোলমালের মধ্যে হোটেলে বসে এটা পড়ে কী রকম লাগবে সন্দেহ আছে। কোথায় সেই পুরীর সমুদ্র আর কোথায় আগ্রার হোটেল। এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়? পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তরসমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী-একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে। কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গনরক, কত বিশ্বাস-সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি— মানবমনের জড়িত জটিল সহস্র রকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার। বৃহৎ সমুদ্রের তীরে কিম্বা মুক্ত আকাশের নীচে একলা না বসলে সেই আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্য ঠিক অনুভব করা যায় না। কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার নেই— আমার যা মনে উদয় হয়েছে আমি তাই ব'লে খালাস— তার পরে সমুদ্র সমভাবে তরঙ্গিত হতে থাকুক, আর মানুষ হাঁসফাঁস করে ঘুরে ঘুরে বেড়াক।

কলিকাতা

৩০ এপ্রিল ১৮৯৩

কাল তাই রাত্রি দশটা পর্যন্ত ছাতে পড়ে থাকতে পেরেছিলুম। চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছিল— চমৎকার হাওয়া দিচ্ছিল— ছাতে আর-কেউ ছিল না। আমি একলা পড়ে পড়ে আমার সমস্ত জীবনের কথা ভাবছিলুম। এই তেতালের ছাত, এইরকম জ্যোৎস্না, এইরকম দক্ষিণের বাতাস জীবনের স্মৃতিতে কত রকমে মিশ্রিত হয়ে আছে। দক্ষিণের বাগানের শিমুগাছের পাতা ঝর্ ঝর্ শব্দ করছিল, আমি অর্ধেক চোখ বুজে আমার ছেলেবেলাকার মনের ভাবগুলিকে মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম। পুরোনো স্মৃতিগুলো মদের মতো; যত বেশিদিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে, ততই তার বর্ণ এবং স্বাদ এবং নেশা যেন মধুর হয়ে আসে। আমাদের এই স্মৃতির বোতলগুলি বুড়ো বয়সের জন্যে 'in the deep-delved earth' ঠাণ্ডা করে রেখে দেওয়া যাচ্ছে— তখন বোধ হয় ছাতের উপর জ্যোৎস্না রাত্রে এক-এক ফোঁটা করে আস্বাদ করতে বেশ লাগবে। অল্প বয়সে মানুষ কেবলমাত্র কল্পনা এবং স্মৃতিতে সন্তুষ্ট থাকে না, কেননা তখন তার রক্তের জোর, তার শরীরের তেজ, তাকে কিছু-একটা কাজে প্রবৃত্ত করতে চায়; কিন্তু বুড়ো বয়সে যখন স্বভাবতই আমরা কাজে অক্ষম, শরীরের যৌবনের অতিরিক্ত তেজ আমাদের কোনোরকম তাড়না করছে না, তখন স্মৃতি বোধ হয় আমাদের পক্ষে যথেষ্ট— তখন জ্যোৎস্নারাত্রের স্থির জলাশয়ের মতো আমাদের অচঞ্চল মনে পূর্বস্মৃতির ছায়া এমনি পরিষ্কার স্পষ্ট ভাবে পড়ে যে, বর্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তার প্রভেদ বোঝা শক্ত।

শিলাইদহ

মে ১৮৯৩

এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা। এখানে আমার উপরে আমার সময়ের উপরে আর-কারও কোনো অধিকার নেই। এই বোটটি আমার পুরোনো ড্রেসিং গাউনের মতো— এর মধ্যে প্রবেশ করলে খুব একটি ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ আলোকপূর্ণ আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।

এখন প্রথম দিনকতক আমার এই পূর্বপরিচিতের সঙ্গে পুনর্মিলনের নতুন বাধো-বাধো ভাবটা কাটাতেই যাবে। তার পরে নিয়মিত লিখতে, পড়তে, নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে, আমাদের পুরাতন সখ্য আবার বেশ সহজ হয়ে আসবে। বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা— আমার যথার্থ বাহন— খুব বেশি পোষ-মানা নয়, কিছু বুনোরকম; কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে— বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে— একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপ্‌ছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গীতে চলে যাচ্ছে, আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো, অতএব তার

কথা যদি কিছু বাহুল্য করে লিখি তবে সে কথাগুলো চিঠিতে লেখবার অযোগ্য মনে করা উচিত হবে না। সেগুলো হচ্ছে এখানকার পার্সোনাল খবরের মধ্যে। এক দিনেই কলকাতার সঙ্গে ভাবের কত তফাত হয়ে যায়। কাল বিকেলে সেখানে ছাতে বসেছিলুম সে এক-রকম, আর আজ এখানে দুপুর বেলায় বোটে বসে আছি এ এক-রকম। কলকাতার পক্ষে যা সেন্টিমেণ্টাল, পোয়েটিকাল, এখানকার পক্ষে তা কতখানি সত্যিকার সত্যি! পাব্লিক-নামক গ্যাসালোক-জ্বালা স্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করে না— এখানকার এই স্বচ্ছ দিবালোক এবং নিভৃত অবসরের মধ্যে গোপনে আপনার কাজ করে যেতে ইচ্ছে করে। নেপথ্যে এসে রঙচঙগুলো ধুয়ে মুছে না ফেললে মনের অশান্তি আর যায় না। সাধনা চালানো, সাধারণের উপকার করা এবং হাঁস্‌ফাঁস্‌ করে মরাটা অনেকটা অনাবশ্যক বলে মনে হয়— তার ভিতরে অনেক জিনিস থাকে যা খাঁটি সোনা নয়, যা খাদ— আর, এই প্রসারিত আকাশ আর সুবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে যদি কারও প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে আপনার গভীর আনন্দে আপনার কাজ করে যাই তা হলেই যথার্থ কাজ হয়।

শিলাইদহ

৮ মে ১৮৯৩

কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী— বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল। তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধারে বটের তলা, বাড়িভিতরের বাগান, বাড়িভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাহিরের জগৎ, এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল। তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারী শক্ত, কিন্তু এইপর্যন্ত বেশ বলতে পারি, কবিকল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালাবদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয়, তা স্বীকার করতে হয়; আর যাই হোক, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক-এক সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তি স্থাপন ক'রে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি— আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে— সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।

৮১

শিলাইদহ
১০ মে ১৮৯৩

ইতিমধ্যে দেখছি খুব ফুলো ফুলো বড়ো বড়ো কতকগুলো মেঘ চতুর্দিক থেকে জমে এসেছে— আমার এই চারি দিকের দৃশ্যপট থেকে কাঁচা সোনালি রোদ্দুরটুকু যেন মোটা মোটা ব্লটিংপ্যাড দিয়ে একেবারে চুপসে তুলে নিয়েছে। আবার যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তা হলে ধিক্ ইন্দ্রদেবকে। মেঘগুলোর তেমন ফাঁকা দরিদ্র চেহারা দেখছি নে, বাবুদের মতো দিব্যি সজলশ্যামল টেবোটোবো নধরনন্দন ভাব। এখনই বৃষ্টি আরম্ভ হল ব'লে— হাওয়াটাও সেইরকম কাঁদো-কাঁদো ভিজে-ভিজে ঠেকছে। এখানে এই মেঘ-রৌদ্রের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর, আকাশের দিকে যে কত লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে, সিমলার সেই অভ্রভেদী পর্বতশৃঙ্গে বসে তা ঠিকটি কল্পনা করা শক্ত হবে। আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে— কোনোমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়। সোশিয়ালিস্ট্‌রা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে— যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য। কেননা পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে,

কোনোকালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যক জিনিসও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনামাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে-পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই— তারা ভারী কঠিন কথা বলে। কিন্তু এ-সমস্ত সামাজিক সমস্যা এমন কঠিন! বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীন বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর-এক দিক বেরিয়ে পড়ে— দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায়, এবং ধন গেলে সমাজের কত যে শ্রীসৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই।... কিন্তু আবার এক-একবার রোদ্‌দুর উঠছে— পশ্চিমে মেঘও যথেষ্ট জমে আছে।

শিলাইদহ
১১ মে ১৮৯৩

কাল বিকেলের দিকে খুব ঘনঘটা ক'রে মেঘ ক'রে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ খানকতক দলভ্রষ্ট বিচ্ছিন্ন মেঘ সূর্যালোকে শুভ্র হয়ে খুব নিরীহ নিরপরাধ ভাবে আকাশের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখে তো মনে হয় এদের বর্ষণের অভিপ্রায় কিছুমাত্র নেই। কিন্তু চাণক্য তাঁর সুবিখ্যাত শ্লোকে যাদের যাদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে দেবতাকেও ধরা উচিত ছিল। আজ সকাল বেলাটি বড়ো সুন্দর হয়ে উঠেছে—আকাশ পরিষ্কার নীল, নদীর জলে রেখামাত্র নেই এবং ডাঙার কাছে গড়ানে জায়গায় যে ঘাসগুলি হয়েছে তাতে পূর্বদিনকার বৃষ্টির কণাগুলি লেগে সেগুলি ঝক্‌ঝক্ করছে। এই-সমস্ত মিলে সূর্যালোকে আজকের প্রকৃতিকে ভারী একটি শুভ্রবসনা মহিমময়ী মহেশ্বরীর মতো দেখাচ্ছে। সকালবেলাটি এমনি নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। কেন জানি নে নদীতে একটি নৌকো নেই, বোটের নিকটবর্তী ঘাটে কেউ জল নিতে — কেউ স্নান করতে আসে নি, নায়েব সকাল-সকাল কাজ সেরে চলে গেছে। খানিকটা চুপ করে কান পেতে থাকলে কী একটা ঝাঁঝাঁ শব্দ শোনা যায় এবং এই রৌদ্রালোক আর আকাশ আস্তে আস্তে প্রবেশ করে মাথার ভিতরটি একেবারে ভরে ওঠে এবং সেখানকার সমুদয় ভাব ও চিন্তাগুলিকে একটি নীল সোনালি রঙে রঙিয়ে দেয়। বোটের এক পাশে একটা বাঁকা কৌচ আনিয়ে রেখেছি, এইরকম সকালবেলায় তার মধ্যে শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত কাজ ফেলে চুপচাপ করে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে, মনে হয়—

নাই মোর পূর্বাপর,
যেন আমি এক দিনে উঠেছি ফুটিয়া
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল।

যেন আমি এই আকাশের, এই নদীর, এই পুরাতন শ্যামল পৃথিবীর। বোটে আমার এই রকম করে কাটে। প'ড়ে প'ড়ে পরিচিত প্রকৃতির কত রকমের যে ভাবের পরিবর্তন দেখি তার ঠিক নেই। এখানে আমার আর-একটি সুখ আছে। এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম! বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো। আমিই যেন এ ভক্তির অযোগ্য, কিন্তু এ ভক্তিটি তো বড়ো সামান্য জিনিস নয়। ছোটো ছেলেদের উপর যেরকম ভালোবাসা এই বৃদ্ধ-ছেলেদের উপর অনেকটা সেইরকম— কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। এরা তাদের চেয়েও ছোটো। কেননা তারা বড়ো হবে, এরা আর কোনো কালেও বড়ো হবে না— এদের এই জীর্ণ শীর্ণ কুঞ্চিত বলিত বৃদ্ধদেহখানির মধ্যে কী-একটি শুভ্র সরল কোমল মন রয়েছে। শিশুদের মনে কেবল সরলতা আছে মাত্র, কিন্তু এমন স্থির বিশ্বাস-পূর্ণ একাগ্রনিষ্ঠা নেই। মানুষে মানুষে যদি সত্যি একটা আধ্যাত্মিক যোগ থাকে তা হলে আমার এই অন্তরের মঙ্গল ইচ্ছা ওর হয়তো কিছু কাজে লাগতে পারে। কিন্তু সব প্রজা এরকম নয়— সেরকম প্রত্যাশা করাও যায় না। সব চেয়ে যা ভালো সব চেয়ে তা দুর্লভ।

৮৩

শিলাইদহ
১৩ মে ১৮৯৩

আজ টেলিগ্রাম পেলুম যে : Missing gown lying post office। এর দুটো অর্থ হতে পারে। এক অর্থ হচ্ছে, হারা গাত্রবস্ত্র ডাকঘরে শুয়ে আছেন। আর-এক অর্থ হচ্ছে, গাউনটা মিসিং এবং পোস্ট-অফিসটা লাইং। দুই অর্থ ই সম্ভব হতে পারে— কিন্তু যে পর্যন্ত প্রতিবাদ না শুনি সে পর্যন্ত প্রথম অর্থটাই গ্রহণ করা গেল। কিন্তু মজা হচ্ছে এই— সঙ্গে সঙ্গে যে চিঠিখানি এসেছে তাতে পরিষ্কার করে বলা আছে, একটা গাউন যে পাওয়া যায় নি তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

বেচারা চিঠি! তার জিম্মায় যে কয়টি কথা লেফাফায় পুরে দেওয়া হয়েছে সেই কয়টি কথা কাঁধে করে নিয়ে দীর্ঘ পথ ঢিকতে ঢিকতে চলে আসছে— ইতিমধ্যে যে পৃথিবীতে কত কী হয়ে যাচ্ছে তা সে জানে না, এবং তার ছোটো ভাই যে এক লম্ফে তাকে ডিঙিয়ে তার সমস্ত কথার একটিমাত্র সংক্ষেপ রূঢ় প্রতিবাদ নিয়ে এসে হাজির হল তারও সে জবাব দিতে পারে না; সে ভালো-মানুষের মতো বলে 'আমি কিছু জানি নে বাপু, আমাকে সে যা ব'লে দিয়েছে আমি তাই বয়ে এনেছি।' বাস্তবিক এনেছে বটে। একটি কথার এ-দিক ও-দিক হয় নি— সমস্ত পথটি মাড়িয়ে দীর্ঘ পথের কত চিহ্ন, আষ্টে-পৃষ্টে কত ছাপ নিয়েই, বেচারা ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। তা হোক তার খবর ভুল, আমি তাকে ভালোবাসি। আর, তারে চ'ড়ে চক্ষের পলকে টেলিগ্রাফ এলেন— কোথাও পথশ্রমের কোনো চিহ্ন নেই— লেফাফাখানি একেবারে রাঙা টক্ টক্ করছে— হড়্‌বড়্ তড়্‌বড় করে দুটো কথা বললেন,

তার ভিতর থেকে আটটা দশটা কথা পড়ে গেছে— তার মধ্যে ব্যাকরণ নেই, ভদ্রতা নেই, কিছু নেই— একটা সম্বোধন নেই, একটা বিদায়ের শিষ্টতাও নেই— আমার প্রতি যেন তার কিছুমাত্র বন্ধুতার ভাব নেই, কেবল কোনোমতে তাড়াতাড়ি কথাটা যেমন-তেমন করে বলে ফেলে দায় কাটিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচে!

শিলাইদহ

১৬ মে ১৮৯৩

আমি বিকেল বেলা সাড়ে ছটার পর স্নান করে ঠাণ্ডা এবং পরিষ্কার হয়ে চরের উপর নদীর ধারে ঘণ্টাখানেক বেড়াই, তার পর আমাদের নতুন জলিবোটটাকে নদীব মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে বিছানাটি পেতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে চিৎ হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি। শ— কাছে বসে নানা কথা বকে যায়। চোখের উপরে আকাশ তারায় একেবারে খচিত হয়ে ওঠে। আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনও জন্মগ্রহণ করব! আর কি কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায়, এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর, বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জলিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব! হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধেবেলা আর কখনও ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্যপরিবর্তন হবে— আর, কিরকম মন নিয়েই বা জন্মাব! এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধ ভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কি ঠিক এমান মানুষটি তখন থাকব! আশ্চর্য এই, আমার সব চেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্ঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার জো নেই এবং প'ড়ে থাকাও সকলে ভারী দোষের বিবেচনা করে। হয়তো একটা কারখানায়, নয়তো ব্যাঙ্কে, নয়তো পার্লামেণ্টে, সমস্ত দেহমনপ্রাণ দিয়ে খাটতে হবে। শহরের রাস্তা যেমন ব্যাবসাবাণিজ্য গাড়িঘোড়া

চলবার জন্যে ইঁটে-বাঁধানো, কঠিন, তেমনি মনটা স্বভাবটা বিজ্‌নেস চালাবার উপযোগী পাকা করে বাঁধানো— তাতে এমটি কোমল তৃণ, একটি অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারী ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কী জানি, তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় অকর্মণ্য আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত-আকাশ-পূর্ণ মনের ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় ব'লে মনে হয় না। জলিবোটে পড়ে পড়ে জগতের সেই কাজের লোকের কাছে আপনাকে কিছুমাত্র খাটো মনে হয় না। বরঞ্চ আমিও যদি কোমর বেঁধে কাজে লাগতুম তা হলে হয়তো সেই-সমস্ত বড়ো বড়ো ওকগাছ-কাটা জোয়ান লোকদের কাছে আপনাকে ভারী যৎসামান্য মনে হত।

৮৫

কলকাতা

২১ জুন ১৮৯৩

এবারকার ডায়ারিটাতে ঠিক প্রকৃতির স্তব নয়— মন-নামক একটা সৃষ্টিছাড়া চঞ্চল পদার্থ কোনো গতিকে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাতে যে কী রকম একটা উৎপাত হয়েছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা গেছে। আসলে, আমরা খাব পরব, বেঁচে থাকব, এইরকম কথা ছিল— আমরা যে বিশ্বের আদিকারণ অনুসন্ধান করি, ইচ্ছাপূর্বক খুব শক্ত একটা ভাব ব্যক্ত করবার প্রয়াস করি, আবার তার মধ্যে পদে পদে মিল থাকা দরকার মনে করি, আপাদমস্তক ঋণে নিমগ্ন হয়েও মাসে মাসে ঘরের কড়ি খরচ করে 'সাধনা' বের করি, এর কী আবশ্যকতা ছিল! ও দিকে নারায়ণ সিং দেখো, ঘি দিয়ে আটা দিয়ে বেশ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে, তার সঙ্গে দধি সংযোগ ক'রে আনন্দমনে ভোজনপূর্বক, দু-এক ছিলিম তামাক টেনে, দুপুরবেলাটা কেমন স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিচ্ছে এবং সকালে বিকালে লোকেনের সামান্য দু-চারটে কাজ করে রাত্রে অকাতরে বিশ্রাম লাভ করছে। জীবনটা যে ব্যর্থ হল, বিফল হল, এমন কখনও তার স্বপ্নেও মনে হয় না; পৃথিবীর যে যথেষ্ট দ্রুতবেগে উন্নতি হচ্ছে না সেজন্যে সে নিজেকে কখনও দায়িক করে না। জীবনের সফলতা কথাটার কোনো মানে নেই— প্রকৃতির একমাত্র আদেশ হচ্ছে 'বেঁচে থাকো'। নারায়ণ সিংহ সেই আদেশটির প্রতি লক্ষ রেখেই নিশ্চিন্ত আছে। আর, যে হতভাগার বক্ষের মধ্যে মন-নামক একটা প্রাণী গর্ত খুঁড়ে বাসা করেছে, তার আর বিশ্রাম নেই; তার পক্ষে কিছুই যথেষ্ট নয়; তার চতুর্দিক্‌বর্তী অবস্থার সঙ্গে সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেছে— সে যখন জলে থাকে তখন স্থলের জন্যে

লালায়িত হয়, যখন স্থলে থাকে তখন জলে সাঁতার দেবার জন্যে তার 'অসীম আকাঙ্ক্ষা'র উদ্রেক হয়। এই দুরন্ত অসন্তুষ্ট মনটাকে প্রকৃতির অগাধ শান্তির মধ্যে বিসর্জন করে একটুখানি স্থির হয়ে বসতে পারলে বাঁচা যায়, কথাটা হচ্ছে এই।

শিলাইদহ
২ জুলাই ১৮৯৩

কোনো জিনিস যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চতুর্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়— তাকে বেশ অনেকখানি মেলিয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে, চতুর্দিকে বিছিয়ে দিয়ে, তবে তাকে ষোলো-আনা আয়ত্ত করা যায়। মফস্বলে একলা থাকবার সময়-যে বন্ধুবান্ধবদের চিঠিপত্র এত ভালো লাগে তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে— প্রত্যেক অক্ষরটি পর্যন্ত একটি একটি ফোঁটার মতো করে নিঃশেষপূর্বক গ্রহণ করবার অবসর পাওয়া যায়; মনের কল্পনা ওর প্রত্যেক কথায় লতিয়ে-লতিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠে— বেশ অনেক ক্ষণ ধরে একটা গতি অনুভব করা যায়। অতি লোভে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সুখের ইচ্ছেটা এমনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এগিয়ে চলে যে, অনেক সময়ে সুখটাকেই ডিঙিয়ে চলে যায়, এবং চক্ষের পলকে সমস্ত ফুরিয়ে ফেলে। এইরকম জমিজমা আমলা-মামলার মধ্যে কোনো চিঠিকেই যথেষ্ট মনে হয় না— মনে হয়, যেন ক্ষুধার যোগ্য অন্ন পাওয়া গেল না। কিন্তু যত বয়স হচ্ছে তত এইটে দেখছি, পাওয়াটা নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অন্যে কতটা দিতে পারে তা নিয়ে নালিশ-ফরিয়াদি করা ভুল, আমি কতটা নিতে পারি এইটেই হচ্ছে আসল কথা। যা হাতের কাছে আসে তাকেই পুরোপুরি হস্তগত করে নেওয়া অনেক শিক্ষা সাধনা এবং সংযমের দ্বারা হয়। সে শিক্ষা লাভ করতে জীবনের প্রায় বারো-আনা কাল চলে যায়, তার পরে সে শিক্ষার ফল ভোগ করবার আর বড়ো সময় পাওয়া যায় না। ইতি সুখতত্ত্বশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়।

৮৭

শিলাইদহ

৩ জুলাই ১৮৯৩

কাল্ সমস্ত রাত তীব্র বাতাস পথের কুকুরের মতো হুহু করে কেঁদেছিল— আর বৃষ্টিও অবিশ্রাম চলছে। মাঠের জল ছোটো ছোটো নির্ঝরের মতো নানা দিক থেকে কল্ কল্ করে নদীতে এসে পড়ছে— চাষারা ও পারের চর থেকে ধান কেটে আনবার জন্যে কেউ বা টোগা মাথায় কেউ বা একখানা কচুপাতা মাথার উপর ধ'রে ভিজতে ভিজতে খেয়া নৌকোয় পার হচ্ছে— বড়ো বড়ো বোঝাই নৌকোর মাথার উপর মাঝি হাল ধ'রে বসে বসে ভিজছে— আর মাল্লারা গুণ কাঁধে করে ডাঙার উপর ভিজতে ভিজতে চলেছে— এমন দুর্যোগ তবু পৃথিবীর কাজকর্ম বন্ধ থাকবার জো নেই। পাখিরা বিমর্ষমনে তাদের নীড়ের মধ্যে বসে আছে, কিন্তু মানুষের ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। আমার বোটের সামনে দুটি রাখাল বালক এক পাল গোরু নিয়ে এসে চরাচ্ছে; গোরুগুলি কচর্-মচর্ শব্দ করে এই বর্ষাসতেজ সরসশ্যামল সিক্ত ঘাসগুলির মধ্যে মুখ ভরে দিয়ে, লেজ নেড়ে, পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে, স্নিগ্ধ-শান্ত নেত্রে আহার করে করে বেড়াচ্ছে— তাদের পিঠের উপর বৃষ্টি এবং রাখাল বালকের যষ্টি অবিশ্রাম পড়ছে, দুইই তাদের পক্ষে সমান অকারণ অন্যায় এবং অনাবশ্যক, এবং দু'ই তারা সহিষ্ণুভাবে বিনা-সমালোচনায় সয়ে যাচ্ছে এবং কচর্-মচর্ করে ঘাস খাচ্ছে। এই গোরুগুলির চোখের দৃষ্টি কেমন বিষণ্ণ শান্ত সুগম্ভীর স্নেহময়— মাঝের থেকে মানুষের কর্মের বোঝা এই বড়ো বড়ো জন্তুগুলোর ঘাড়ের উপর কেন পড়ল! নদীর জল প্রতিদিনই বেড়ে উঠছে। পরশুদিন বোটের ছাতের উপর থেকে যতখানি দেখা যেত, আজ

বোটের জানলায় বসে প্রায় ততটা দেখা যাচ্ছে— প্রতিদিন সকালে উঠে দেখি তটদৃশ্য অল্প অল্প করে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। এতদিন সামনে ঐ দূর গ্রামের গাছপালার মাথাটা সবুজ পল্লবের মেঘের মতো দেখা যেত— আজ সমস্ত বনটা আগাগোড়া আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। ডাঙা এবং জল দুই লাজুক প্রণয়ীর মতো অল্প অল্প করে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্ছে। লজ্জার সীমা উপছে এল বলে— প্রায় গলাগলি হয়ে এসেছে। এই ভরা বাদরে ভরা নদীর মধ্যে দিয়ে নৌকো করে যেতে বেশ লাগবে— বাঁধা বোট ছেড়ে দেবার জন্যে মনটা অধীর হয়ে আছে।

শিলাইদহ
৪ জুলাই ১৮৯৩

আজ সকাল বেলায় অল্প অল্প রৌদ্রের আভাস দিচ্ছে। কাল বিকেল থেকে বৃষ্টি ধরে গেছে, কিন্তু আকাশের ধারে ধারে স্তরে স্তরে এত মেঘ জমে আছে যে বড়ো আশা নেই। ঠিক যেন মেঘের কালো কার্পেটটা সমস্ত আকাশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে এক প্রান্তে পাকিয়ে জড়ো করেছে, এখনই একটা ব্যস্তবাগীশ বাতাস এসে আবার সমস্ত আকাশময় বিছিয়ে দিয়ে যাবে, তখন নীলাকাশ এবং সোনালি রৌদ্রের কোনো চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না। এবারে এত জলও আকাশে ছিল! আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে— আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি— যখন আর কয়দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারা যায়। যদি ঐ শিষের মধ্যে দুটো চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা। প্রকৃতির কার্যপ্রণালীর মধ্যে দয়া জিনিসটা কোনো-এক জায়গায় আছে অবশ্য, নইলে আমরা পেলুম কোথা থেকে— কিন্তু সেটা যে ঠিক কোন্‌খানে আছে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এই শতসহস্র নির্দোষ হতভাগ্যের নালিশ কোনো জায়গায় গিয়ে পৌঁচচ্ছে না, বৃষ্টি যেমন পড়বার তেমনি পড়ছে, নদী যেমন বাড়বার তেমনি বাড়ছে, বিশ্বসংসারে এ সম্বন্ধে কারও কাছে কোনো দরবার পাবার জো নেই। মনকে বোঝাতে হয় যে কিছু বোঝবার জো নেই— কিন্তু জগতে যে দয়া এবং ন্যায়বিচার আছে এটুকু বোঝা নিতান্ত

আবশ্যক। কিন্তু এ সমস্ত মিথ্যে খুঁৎখুঁৎ মাত্র— কেননা সৃষ্টি কখনোই সম্পূর্ণ সুখের হতে পারে না। যতক্ষণ অপূর্ণতা ততক্ষণ অভাব, ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তা হলেই কোথাও কোনো খুঁত থাকত না— কিন্তু ততটা দূর পর্যন্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, সৃষ্টি হল কেন— কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি যদি না করা যায় তা হলে, জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেইজন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে চায়; তারা বলে যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই। খৃস্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিস, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্যে দুঃখ বহন করছেন। কিন্তু নৈতিক দুঃখ এক, আর পাকা ধান ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি, যা হয়েছে বেশ হয়েছে; এই-যে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চর্য জগৎ হয়েছে, বড়ো তোফা হয়েছে— এমন জিনিসটা নষ্ট না হলেই ভালো। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন, এ জিনিসটা যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে দুঃখ সইতে হবে। আমি নরাধম তদুত্তরে বলি, ভালো জিনিস এবং প্রিয় জিনিস রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতে হয় তা হলে দুঃখ সব'— তা, আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক; মাঝে মাঝে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে, কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালোবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি তখন তো আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না।

ইছামতী
৭ জুলাই ১৮৯৩

কাল সমস্ত দিন বেশ পরিষ্কার ছিল। অনেক দিন পরে মেঘ কেটে রৌদ্রে দশ দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; প্রকৃতি যেন স্নানের পর নতুন-ধোওয়া বাসন্তী রঙের কাপড়টি প'রে পরিচ্ছন্ন প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখে ভিজে চুলটি মৃত্নমন্দ বাতাসে শুকোচ্ছিলেন। কাজ সেরে বেলা সাড়ে চারটে-পাঁচটার সময় যখন বোট ছেড়ে দিলুম তখন পূর্বদিকে খুব একটা গাঢ় মেঘ উঠল। ক্রমশ একটু বাতাস এবং বৃষ্টিও যে হয় নি তা নয়। সেই শাখানদীটার ভিতরে যখন ঢুকলুম, বৃষ্টি ধরে গেল। জলে চর ভেসে গেছে— মানুষপ্রমাণ লম্বা ঘাস এবং ঝাউবনের ভিতর দিয়ে সর্ সর্ শব্দে গুণ টেনে বোট চলতে লাগল। খানিক দূরে গিয়ে অনুকূল বাতাস পাওয়া গেল। পাল তুলে দিতে বললুম, পাল তুলে দিলে। তু দিকে ঢেউ কেটে কল্ কল্ শব্দ তুলে বোট সগর্বে চলে যেতে লাগল। আমি বাইরে চৌকি নিয়ে বসলুম। সেই নিবিড় নীল মেঘের অন্তরালে অর্ধনিমগ্ন জলশূন্য চর এবং পরিপূর্ণ দিগন্ত-প্রসারিত নদীর মধ্যে সূর্যাস্ত যে কী জিনিস সে আমি বর্ণনা করতে চেষ্টা করব না। বিশেষত আকাশের অতিদূর প্রান্তে পদ্মার জলরেখার ঠিক উপরেই মেঘের যেখানে ফাঁক পড়েছে সেখানটা এমনি অতি-মাত্রায় সূক্ষ্মতম সোনালিতম হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেই স্বর্ণপটের উপর সারি সারি লম্বা কৃশ গাছগুলির মাথা এমনি সুকোমল সুনীল রেখায় অঙ্কিত হয়েছিল— প্রকৃতি সেখানে যেন আপনার চরম পরিণতিতে পৌঁছে একটা কল্পলোকের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। মাঝি জিজ্ঞাসা করলে, বোট চরের কাছারিঘাটে রাখব কি? আমি বললুম, না পদ্মা পেরিয়ে চল্। মাঝি পাড়ি দিলে— বাতাস বেগে বইতে লাগল,

পদ্মা নৃত্য করতে লাগল, পাল ফুলে উঠল, দিনের আলো মিলিয়ে এল, আকাশের ধারের মেঘগুলি ক্রমে আকাশের মাঝখানে ঘনঘটা করে জমে গেল, চার দিকে পদ্মার উদ্দামচঞ্চল জল করতালি দিচ্ছে — সম্মুখে দূরে নীল মেঘস্তূপের নীচে পদ্মাতটের নীল বনরেখা দেখা যাচ্ছে— নদীর মাঝখানে আমাদের বোট ছাড়া আর-একটিও নৌকো নেই— তীরের কাছে দুই-একটা জেলে ডিঙি ছোটো ছোটো পাল উড়িয়ে গৃহমুখে চলেছে ; আমি যেন প্রকৃতির রাজার মতো বসে আছি আর আমাকে তার দুরন্ত ফেনিলমুখ রাজ-অশ্ব সনৃত্য-গতিতে বহন করে নিয়ে চলেছে।

৯০

সাজাদপুর
৭ জুলাই ১৮৯৩

ছোটোখাটো গ্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট, টিনের-ছাত-ওয়ালা বাজার, বাঁখারির-বেড়া-দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম কাঁঠাল খেজুর শিমুল কলা আকন্দ ভেরেণ্ডা ওল কচু লতাগুল্ম তৃণের সমষ্টিবদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল, ঘাটে-বাঁধা মাস্তুল-তোলা বৃহদাকার নৌকোর দল, নিমগ্নপ্রায় ধান এবং অর্ধমগ্ন পাটের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত এঁকে বেঁকে কাল সন্ধের সময় সাজাদপুরে এসে পৌঁচেছি। এখন কিছু দিনের মতো এইখানেই স্থায়ী হওয়া গেল। অনেক দিন বোটে থাকার পর সাজাদপুরের বাড়িটা বেশ লাগে ভালো— একটা যেন নূতন স্বাধীনতা পাওয়া যায়— যতটা খুশি নড়বার চড়বার এবং শরীর প্রসারণ করবার জায়গা পাওয়া মানুষের মানসিক সুখের যে একটা প্রধান অঙ্গ সেটা হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়। আজ প্রাতে মাঝে মাঝে বেশ একটুখানি রৌদ্র দেখা দিচ্ছে, বাতাসটি চঞ্চলবেগে বচ্ছে, ঝাউ এবং লিচু গাছ ক্রমাগত সর্‌সর্ মর্‌মর্ করে দুলছে, নানাজাতির পাখি নানা ভাষা নানা সুরে ডেকে ডেকে প্রাতঃকালের আরণ্য মজলিস সরগরম করে তুলেছে। আমি আমাদের দোতলার এই সঙ্গীহীন প্রশস্ত নির্জন আলোকিত উন্মুক্ত ঘরের মধ্যে বসে জানলা থেকে খালের উপরকার নৌকাশ্রেণী, ও পারের তরুমধ্যগত গ্রাম এবং ও পারের অনতিদূরবর্তী লোকালয়ে মৃদু কর্মপ্রবাহ নিরীক্ষণ করে বেশ একটুখানি মনের আনন্দে আছি। পাড়াগাঁয়ের কর্মস্রোত খুব বেশি তীব্রও নয়, অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নির্জীবও নয়। কাজ এবং বিশ্রাম দুই যেন পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি করে চলেছে। খেয়ানৌকো পারাপার করছে, পান্থরা ছাতা হাতে করে খালের

ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্ছে, চাষারা আঁটি-বাঁধা পাট মাথায় করে হাটে আসছে— দুটো লোক একটা গাছের গুঁড়ি মাটিতে ফেলে কুড়ুল নিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দে কাঠ চেলা করছে, একটা ছুতোর অশথগাছের তলায় জেলেডিঙি উলটে ফেলে বাটারি হাতে মেরামত করছে, গ্রামের কুকুরটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুটিকতক গোরু বর্ষার ঘাস অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহারপূর্বক অলসভাবে রৌদ্রে মাটির উপর পড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে, এবং কাক এসে তাদের মেরুদণ্ডের উপর বসে যখন বড়ো বেশি বিরক্ত করছে তখন একবার পিঠের দিকে মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে। এখানকার এই দুই-একটা একঘেয়ে ঠক্‌ঠক্ ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ, উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের ঝুপ্‌ঝাপ ধ্বনি, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিখাদ স্বর, সমস্ত কর্মকোলাহল একত্র মিলে এই পাখির ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য ঘটাচ্ছে না— সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময় স্বপ্নময় করুণা-মাখা একটা বড়ো সংগীতের অন্তর্গত— খুব বিস্তৃত বৃহৎ অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা। আমার মাথার মধ্যে সূর্যের আলোক এবং এই-সমস্ত শব্দ একেবারে যেন কানায় কানায় ভরে এসেছে, অতএব চিঠি বন্ধ করে খানিক ক্ষণ পড়ে থাকা যাক।

সাজাদপুর
১০ জুলাই ১৮৯৩

এসব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো। সুরটা যে মন্দ হয়েছে এমন আমার বিশ্বাস নয়, এমন-কি ভালো হয়েছে বললে খুব বেশি অত্যুক্তি হয় না। ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেক দিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিলুম। নাবার ঘরে গান তৈরি করবার ভারী কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোনো কর্তব্যের কোনো দাবি থাকে না। মাথায় এক টিন জল ঢেলে পাঁচ মিনিট গুন্ গুন্ করলে কর্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগে না— সব চেয়ে সুবিধা হচ্ছে কোনো দর্শক-সম্ভাবনা-মাত্র না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গি করা যায়। মুখভঙ্গি না করলে গান তৈরি করবার পুরো অবস্থা কিছুতেই আসে না। ওটা কিনা ঠিক যুক্তিতর্কের কাজ নয়— নিছক ক্ষিপ্ত ভাব। এ গানটা আমি এখনো সর্বদা গেয়ে থাকি— আজ প্রাতঃকালেও অনেক ক্ষণ গুন্ গুন্ করেছি, গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায়। অতএব এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

এখানে আমি একলা খুব মুগ্ধ এবং তদ্গত চিত্তে অর্ধনিমীলিতনেত্রে গেয়ে থাকি এবং জীবন ও পৃথিবীটা একটি সূর্যকরোজ্জ্বল অতি সূক্ষ্ম অশ্রুবাষ্পে আবৃত হয়ে, সাতরঙা ইন্দ্রধনু-রেখায় রঞ্জিত হয়ে দেখা দেয় —প্রতিদিনের সত্যকে চিরদিনের সৌন্দর্যের মধ্যে তর্জমা ক'রে দেওয়া যায়— দুঃখকষ্টও আভাময় হয়ে ওঠে। অনতিবিলম্বেই খাজাঞ্চি এক ছটাক মাখন, এক পোয়া ঘি ও ছয় পয়সার সর্ষপতৈলের হিসাব এনে উপস্থিত করে। আমার এখানকার ইতিহাস এই-রকম।

সাজাদপুর
৩০ আষাঢ় ১৮৯৩

আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপন-নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো হয়ে পড়েছে— এ দিকে আগামী মাসের 'সাধনা'র জন্যে একটি লাইন লেখা হয় নি, ও দিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া আসছে, অনতিদূরে আশ্বিন-কার্তিকের যুগল 'সাধনা' রিক্তহস্তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা করছে, আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি। রোজ মনে করি, আজ একটা দিন বৈ তো নয়— এমনি করে কত দিন কেটে গেল। আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয়, আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে— লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক-এক সময় মনে হয় আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো; বোধ হয় তাতে ফলও আছে, আনন্দও আছে। এক-এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর-কেউ করছে না তখন কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তব্যটা গ্রহণ করতে হয়— আবার এক-এক সময় মনে হয়, দূর হোক গে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন; মিল ক'রে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে

চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে— কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হয়তো 'দীর্ঘ দৌড়ে' কোনোটিই পরিপূর্ণভাবে আমার আয়ত্ত হয় না। সাহিত্যবিভাগেও কর্তব্যবুদ্ধির অধিকার আছে, কিন্তু অন্য বিভাগের কর্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে তার একটু প্রভেদ আছে। কোন্‌টাতে পৃথিবীর সব চেয়ে উপকার হবে সাহিত্য-কর্তব্যজ্ঞানে সে কথা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কোন্‌টা আমি সব চেয়ে ভালো করতে পারি সেইটেই হচ্ছে বিচার্য। বোধ হয় জীবনের সকল বিভাগেই তাই। আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে তাতে তো বোধ হয়, কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয়, এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না; আবার যখন একটা-কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই কী, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয়, এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা ব'লে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই— তাঁর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ— তূলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সব চেয়ে

সুবিধে— বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সব চেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন ; আমার ছেলেবেলাকার, আমার বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী।

নীরব কবি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সরব এবং নীরবের মধ্যে অনুভূতির পরিমাণ সমান থাকতে পারে, কিন্তু আসল কবিত্ব জিনিসটি স্বতন্ত্র। কেবল ভাষার ক্ষমতা ব'লে নয়, গঠন করবার শক্তি। একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্যবলে ভাবগুলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। সেই সৃজনক্ষমতাই কবিত্বের মূল। ভাষা ভাব এবং অনুভাব তার সরঞ্জাম মাত্র। কারও বা ভাষা আছে, কারও বা অনুভাব আছে, কারও বা ভাষা এবং অনুভাব দুই আছে, কিন্তু আর-একটি ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনুভাব এবং সৃজনীশক্তি আছে— এই শেষোক্ত লোকটিকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে। প্রথমোক্ত তিনটি লোক নীরবও হতে পারেন, সরবও হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কবি নন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাবুক বললেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়। তাঁরাও জগতে অত্যন্ত দুর্লভ এবং কবির তৃষিত চিত্ত সর্বদাই তাঁদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।

উপরের এই ভূমিকার পরে আমার সেই 'জাল ফেলা' কবিতাটার ব্যাখ্যা একটু সহজ হবে। লেখাটা চোখের সামনে থাকলে তার মানে নিজে একটু ভালো ক'রে বুঝে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারতুম— তবু একটা ঝাপসা রকমের ভাব মনে আছে। মনে করো, একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিল ; সে সমুদ্রটা তার আপনার মন কিম্বা ঐ বাহিরের বিশ্ব কিম্বা উভয়ের সীমানা-মধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার, সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। যাই হোক, সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের

দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল, এই রহস্যপাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক-না কী পাওয়া যায়। এই ব'লে তো সে ঘুরিয়ে জাল ফেললে। নানা রকমের অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল— কোনোটা বা হাসির মতো শুভ্র, কোনোটা বা অশ্রুর মতো উজ্জ্বল, কোনোটা বা লজ্জার মতো রাঙা। মনের উৎসাহে সে সমস্ত দিন ধ'রে ঐ কাজই কেবল করলে; গভীর তলদেশে যে-সকল সুন্দর রহস্য ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশীকৃত করে তুললে। এমনি ক'রে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে এবারকার মতো যথেষ্ট হয়েছে, এখন এইগুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাক গে। কাকে যে, সে কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয় নি— হয়তো তার প্রেয়সীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু যাকে দেবে সে তো এ-সমস্ত অপূর্ব জিনিস কখনো দেখে নি। সে ভাবলে, এগুলো কী, এর আবশ্যকতাই বা কী, এতে কী অভাব দূর হবে, দোকান-দারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে। এক কথায় এ বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়; এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাবমাত্র; তারও যে কোন্‌টার কী নাম, কী বিবরণ তারও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলত সমস্ত দিনের জাল-ফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল সে বললে, এ আবার কী? জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হল, সত্যি বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তুলেছি; আমি তো হাটেও যাই নি, পয়সা-কড়িও খরচ করি নি, এর জন্যে তো আমাকে কাউকে এক পয়সা খাজনা কিম্বা মাশুল দিতে হয় নি। সে তখন কিঞ্চিৎ বিষণ্নমুখে লজ্জিতভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে ব'সে ব'সে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পরদিন সকালবেলায়

পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিসগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন, তিনি মনে করছেন তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারবে না; তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়; অতএব এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে—তোমরাও অবহেলা করো, আমিও অবহেলা করি, কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে? যাই হোক, 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘ-রাত্রি ধ'রে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশি-শেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে, এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারও বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে। সেই মন্দিরের কবিতার ঠিক অর্থটা কী, ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় সেটা সত্যিকার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাৎ, যখন কোণে ব'সে ব'সে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন ক'রে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে, এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র প'ড়ে সেই-সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র-ধূপধুনার স্থান অধিকার করে— এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।

পতিসর

১১ অগস্ট ১৮৯৩

অনেকগুলো বড়ো বড়ো বিলের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারী অদ্ভুত— কোনো আকার আয়তন নেই, জলে স্থলে একাকার; পৃথিবী সমুদ্রগর্ভ থেকে নতুন জেগে উঠবার সময় যেমন ছিল। কোথাও কিছু কিনারা নেই— খানিকটা জল, খানিকটা মগ্নপ্রায় ধানক্ষেতের মাথা; খানিকটা শেওলা এবং জলজ উদ্ভিদ ভাসছে; পানকৌড়ি সাঁতার দিচ্ছে; জাল ফেলবার জন্যে বড়ো বড়ো বাঁশ পোঁতা, তারই উপর কটা রঙের বড়ো বড়ো চিল ব'সে আছে। ভারী একাকার একঘেয়ে রকমের দৃশ্য। দ্বীপের মতো অতিদূরে গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে; যেতে যেতে হঠাৎ আবার খানিকটা নদী; দু ধারে গ্রাম, পাটের ক্ষেত এবং বাঁশের ঝাড়, আবার কখন যে সেটা বিস্তৃত বিলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে বোঝবার জো নেই।

ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকোয় অনেকগুলো ছোকরা ঝপ্ ঝপ ক'রে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—

যোবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী।

পাবনা থাক্যে আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোটরি।

স্থানীয় কবিটি যে ভাব অবলম্বন ক'রে সংগীত রচনা করেছেন আমরাও ও ভাবের ঢের লিখেছি, কিন্তু ইতরবিশেষ আছে। আমাদের যুবতী মন ভারী করলে তৎক্ষণাৎ জীবনটা কিম্বা নন্দন-কানন থেকে পারিজাতটা এনে দিতে প্রস্তুত হই; কিন্তু এ অঞ্চলের লোক খুব সুখে আছে বলতে হবে, অল্প ত্যাগস্বীকারেই যুবতীর মন

পায়। মোটরি জিনিসটি কী তা বলা আমার সাধ্য নয়, কিন্তু তার দামটাও নাকি পার্শ্বেই উল্লেখ করা আছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে, খুব বেশি দুর্মূল্য নয় এবং নিতান্ত অগম্য স্থান থেকেও আনতে হয় না। গানটা শুনে বেশ মজার লাগল; যুবতীর মন ভারী হলে জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় এই বিলের প্রান্তেও তার একটা সংবাদ পাওয়া গেল। এ গানটি কেবল অস্থানেই হাস্যজনক, কিন্তু দেশকালপাত্রবিশেষে এর যথেষ্ট সৌন্দর্য আছে; আমার অজ্ঞাত-নামা গ্রাম্য কবিভ্রাতার রচনাগুলিও এই গ্রামের লোকের সুখ-দুঃখের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক— আমার গানগুলি সেখানে কম হাস্যজনক নয়।

পতিসর

১৩ অগস্ট ১৮৯৩

এবার এই বিলের পথ দিয়ে কালিগ্রামে আসতে আসতে আমার মাথায় একটি ভাব বেশ পরিষ্কার রূপে ফুটে উঠেছে। কথাটা নতুন নয়, অনেক দিন থেকে জানি, কিন্তু তবু এক-একবার পুরোনো কথাও নতুন ক'রে অনুভব করা যায়। দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না-থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকে না। অনির্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত বিল একঘেয়ে, শোভাশূন্য। ভাষার পক্ষে ছন্দের বাঁধন ঐ তীরের কাজ করে। ভাষাকে একটি বিশেষ আকার এবং বিশেষ শোভা দেয়, তার একটি সুন্দর চেহারা ফুটে ওঠে। তীরবদ্ধ নদীগুলির যেমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, তাদের যেমন এক-একটি স্বতন্ত্র লোকের মতো মনে হয়, ছন্দের দ্বারা কবিতা সেইরূপ এক-একটি মূর্তিমান অস্তিত্বের মতো দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যের সেইরকম সুন্দর সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই, সে একটা বৃহৎ বিশেষত্বহীন বিলের মতো। আবার, তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে, একটা গতি আছে ; কিন্তু প্রবাহহীন বিল কেবল বিস্তৃতভাবে দিগ-বিদিক গ্রাস ক'রে প'ড়ে থাকে। ভাষার মধ্যেও যদি একটা আবেগ একটা গতি দেবার প্রয়োজন হয় তবে তাকে ছন্দের সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে দিতে হয় ; নইলে সে কেবল ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সমস্ত বল নিয়ে এক দিকে ধাবিত হতে পারে না। বিলের জলকে পল্লি-গ্রামের লোকেরা বলে বোবা জল ; তার কোনো ভাষা নেই, আত্ম-প্রকাশ নেই। তটবদ্ধ নদীর মধ্যে সর্বদা একটা কলধ্বনি শোনা যায় ; ছন্দের মধ্যে বেঁধে দিলে কথাগুলোও সেইরকম পরস্পরের প্রতি আঘাত সংঘাত ক'রে একটা সংগীতের সৃষ্টি করতে থাকে— সেইজন্যে

ছন্দের ভাষা বোবা ভাষা নয়, তার মুখে সর্বদাই কলগান। বাঁধনের মধ্যে থাকাতেই গতির সৌন্দর্য, ধ্বনির সৌন্দর্য এবং আকারের সৌন্দর্য। বাঁধনের মধ্যে থাকাতে যেমন সৌন্দর্য তেমনি শক্তি। কবিতা যে স্বভাবতই ধীরে ধীরে একটি ছন্দের মধ্যে ধরা দিয়ে আপনাকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছে ওটা একটি কৃত্রিম অভ্যাসজাত সুখ দেবার জন্যে নয়, ওর একটি গভীর স্বাভাবিক সুখ আছে। অনেক মূর্খ মনে করে, কবিতার ছন্দোবন্ধ কেবল একটা বাহাদুরি করা, ওতে কেবল সাধারণ লোকের বিস্ময় উৎপাদন ক'রে সুখ দেয়, ও কেবল ভাষার ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু, সে ভারী ভুল। কবিতার ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে, বিশ্বজগতের সমস্ত সৌন্দর্যই সেই নিয়মে সৃষ্ট হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে ব'লেই সৌন্দর্যের এমন অনিবার্য শক্তি। আর সুষমার বন্ধন ছাড়িয়ে গেলেই সব একাকার হয়ে যায়, তার আর আঘাত করবার শক্তি থাকে না। বিল ছাড়িয়ে যেমনি নদীতে এবং নদী ছাড়িয়ে যেমনি বিলে গিয়ে পড়ছিলুম, অমনি আমার মনে এই তত্ত্বটি দেদীপ্যমান হয়ে জেগে উঠছিল।

পতিসর

২৬ শ্রাবণ ১৮৯৩

আমি অনেক দিন থেকে ভেবে দেখেছি, পুরুষরা কিছু খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ। মেয়েদের কথাবার্তা, বেশভূষা, চালচলন, আচারব্যবহার এবং জীবনের কর্তব্যের মধ্যে একটি অখণ্ড সামঞ্জস্য আছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, যুগ যুগান্তর থেকে প্রকৃতি তাদের কর্তব্য নিজে নির্দিষ্ট ক'রে দিয়ে তাদের আগাগোড়া সেই ভাবে, সেই উদ্দেশ্যে গঠিত ক'রে দিয়েছে। এ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন, কোনো রাষ্ট্রবিপ্লব, সভ্যতার কোনো ভাঙন-গড়নে তাদের সেই ঐক্য থেকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দেয় নি; তারা বরাবর সেবা করেছে, ভালো বেসেছে, আদর করেছে, আর-কিছু করে নি। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভাষায় ভঙ্গীতে সেই কাজের নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য যেন মিশে এক হয়ে গেছে; তাদের স্বভাব এবং তাদের কাজ যেন পুষ্প এবং পুষ্পের গন্ধের মতো সম্মিলিত হয়ে গেছে; তাদের মধ্যে সেই জন্যে কোনো বিরোধ, কোনো ইতস্তত নেই। পুরুষের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর উঁচুনিচু; তারা যে নানা কার্য, নানা শক্তি, নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তৈরি হয়ে এসেছে, তাদের অঙ্গে এবং স্বভাবে তার যেন চিহ্ন রয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই, কপালটা হয়তো বৃহৎ উঁচু হয়ে উঠল, মাঝের থেকে হয়তো নাকটা এমনি ঠেলে উঠল যে তাকে কার সাধ্য দাবিয়ে রাখে, চোয়াল দুটো হয়তো সুষমার কোনো নিয়ম মানলে না। যদি চিরকাল পুরুষ এক ভাবে চালিত, এক কার্যে শিক্ষিত হয়ে আসত, তা হলে তাদেরও মুখে এবং স্বভাবে একটা সামঞ্জস্য দাঁড়িয়ে যেত, একটা ছাঁচ বহুকাল থেকে তৈরি হয়ে যেত; তা হলে তাদের আর বল প্রকাশ ক'রে,

বহু চিন্তা ক'রে কাজ করতে হত না; সকল কাজ সুন্দরভাবে সহজে সম্পন্ন হত; তা হলে তাদের একটা সহজ নীতিও দাঁড়িয়ে যেত— অর্থাৎ, বহু যুগ থেকে অবিচ্ছেদে যে কাজ ক'রে আসছে সেই কাজের কাছে তাদের মন বশ মানত, সেই বহু যুগের অভ্যস্ত কর্তব্য থেকে কোনো সামান্য শক্তি তাদের বিক্ষিপ্ত করতে পারত না। স্ত্রীলোককে প্রকৃতি মা ক'রে দিয়ে তাকে একেবারে ছাঁচে ঢালাই করে ফেলেছে; পুরুষের সেরকম কোনো স্বাভাবিক আদিম বন্ধন নেই, সেইজন্যে একটি ধ্রুবকেন্দ্র-আশ্রয়ে পুরুষ সর্বতোভাবে তৈরি হয়ে যায় নি; সে চিরকাল ধ'রে কেবলই বিক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে এসেছে, তার শতমুখী উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি তাকে একটি সুন্দর সমগ্রতায় গড়ে তোলে নি। আমি সেদিনকার চিঠিতে বন্ধনকে সৌন্দর্যের কারণ ব'লে অনেকখানি লিখেছিলুম মনে আছে; মেয়েরা সেইরকম একটি স্বাভাবিক ছন্দের বন্ধনে সম্পূর্ণ সুন্দর হয়ে তৈরি হয়ে এসেছে, আর পুরুষরা গদ্যের মতো বন্ধনহীন এবং সৌন্দর্যহীন— তাদের আগাগোড়ার মধ্যে কোনো একটি 'ছাঁদ নেই'। মেয়েদের সঙ্গে যে লোকে চিরকাল সংগীতের, কবিতার, লতার, ফুলের, নদীর তুলনা দিয়ে এসেছে এবং কখনো পুরুষের সঙ্গে দেবার কথা তাদের মনেও উদয় হয় নি তার কারণই এই। প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর জিনিস যেমন সুসম্বদ্ধ সুসম্পূর্ণ সুসংহত সুসংযত মেয়েরাও সেইরকম; তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা, কোনো চিন্তা, কোনো মন এসে তাদের ছন্দোভঙ্গ করে দিচ্ছে না; কোনো তর্ক এসে তাদের মিল নষ্ট করে দিচ্ছে না।

কলকাতা
২১ অগস্ট ১৮৯৩

আজ কতকগুলো খবরের কাগজের কাঁচিছাঁটা টুক্‌রো পাওয়া গেল। কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট্‌-সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালিগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের দুঃখদৈন্যনিবেদন। আমার কাছে এই-সমস্ত দুঃখপীড়িত অটল-বিশ্বাস-পরায়ণ অনুরক্ত প্রজাদের মুখে বড়ো একটি কোমল মাধুর্য আছে, বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই-সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্তনির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে একটা সুখ আছে। এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য-সহকারে সহ্য করেছে, তবু এদের ভালোবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না। আজ একজন এসে বলছিল, 'সে বছর ভালো ধান হয় নি ব'লে চুঁচড়োয় বুড়ো বাপের কাছে এন্‌ছাপ নিতে গিয়েছিলুম ; তা সে বললে, আমি তোদের কিছু ছেড়ে দিচ্ছি, তোরাও আমাকে কিছু খেতে দিস। তার কাছে দরবার করতে গিয়েছিলুম ব'লে সেই মনোবাদে এখানকার আমিন আমাকে ফেরেবি মকদ্দমা ক'রে তিন মাস জেল খাটিয়েছিল। আমি তখন তোমার মাটিকে সেলাম করে ভিন এলাকায় গিয়েছিলুম।' কিন্তু তবু তার এমনি ভক্তি যে সেই ভিন এলাকার জমিদার আমাদের কতক জমি চুরি ক'রে ভোগ করছিল ব'লে সে এখানকার সেরেস্তায় জানিয়ে যায়, সেই রাগে তার নতুন জমিদার তার ধানসুদ্ধ জমি কেড়ে নিয়েছে। সে বলে, 'আমি যার মাটিতে বুড়োকাল পর্যন্ত মানুষ হয়েছি তার হিতের কথা তাকে আমি বলতে পাব না ?' এই ব'লে সে চোখ থেকে দুই-এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে। সে যে কেমন সহজে কোনোরকম চাতুরি

না ক'রে যেন একটা খবর দিয়ে যাবার মতো সমস্তটা ব'লে গেল তা দেখলে এই ব্যাপারটার যথার্থ গভীরতা বুঝতে পারা যায়। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয়, তা এরা জানে না। কিন্তু, তবু প্যারিসের সভ্যতা থেকে কত তফাত। সে এর চেয়ে কত কঠিন, কত উজ্জ্বল, কত সুগঠিত। তবু এখানকার মানুষের মধ্যে যে জিনিসটি আছে সে বড়ো অনাদরের নয়। যতক্ষণ না সভ্যতার মাঝখানে এই স্বচ্ছ সরলতার প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ সভ্যতা কখনোই সম্পূর্ণ এবং সুন্দর হবে না। সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়— সে যেন গঙ্গার মতো, তার মধ্যে স্নান ক'রে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়। আর, য়ুরোপ সমস্ত তাপকে যেন লালন করে তুলছে এবং তার উপরে আবার সহস্রবিধ মাদকতার কৃত্রিম উত্তাপে আপনাকে রাত্রিদিন উত্তেজিত করে তুলছে। খবরের কাগজের যে-কটি টুকরো এসেছে প্রত্যেকটিতেই এই প্রমাণ দেয়।

৯৭

পতিসর

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

যে পারে বোট লাগিয়েছি এ পারে খুব নির্জন। গ্রাম নেই, বসতি নেই, চষা মাঠ ধু ধু করছে, নদীর ধারে ধারে খানিকটা ক'রে শুকনো ঘাসের মতো আছে— সেই ঘাসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোটা-কতক মোষ চরে বেড়াচ্ছে। আর, আমাদের দুটো হাতি আছে, তারাও এ পারে চরতে আসে। তাদের দেখতে বেশ মজা লাগে। একটা পা উঠিয়ে ঘাসের গোড়ায় দুচার বার একটু একটু ঠোকর মারে, তার পরে শুঁড় দিয়ে টান মারতেই বড়ো বড়ো ঘাসের চাপড়া একেবারে মাটিসুদ্ধ উঠে আসে, সেই চাপড়াগুলো শুঁড়ে ক'রে দুলিয়ে দুলিয়ে ঝাড়ে, তার মাটিগুলো ঝ'রে ঝ'রে প'ড়ে যায়, তার পরে মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে খেয়ে ফেলে। আবার এক-এক সময় খেয়াল যায়, খানিকটা ধুলো শুঁড়ে করে নিয়ে ফুঁ দিয়ে নিজের পেটে পিঠে সর্বাঙ্গে হূস্ করে ছড়িয়ে দেয়— এইরকম তো হাতির প্রসাধনক্রিয়া। বৃহৎ শরীর, বিপুল বল, শ্রীহীন আয়তন, অত্যন্ত নিরীহ— এই প্রকাণ্ড জন্তুটাকে দেখতে আমার বেশ লাগে। এর এই প্রকাণ্ডত্ব এবং বিশ্রীত্বর জন্যেই যেন এর প্রতি একটা কী বিশেষ স্নেহের উদ্রেক হয়; এর সর্বাঙ্গের অসৌষ্ঠব থেকে একে একটা মস্ত শিশুর মতো মনে হয়। তা ছাড়া জন্তুটা বড়ো উদার প্রকৃতির— শিব ভোলানাথের মতো— যখন খেপে তখন খুব খেপে, যখন ঠাণ্ডা হয় তখন অগাধ শান্তি। বড়োত্বর সঙ্গে সঙ্গে যে এক-রকম শ্রীহীনত্ব আছে তাতে অন্তরকে বিমুখ করে না, বরঞ্চ আকর্ষণ করে আনে। আমার ঘরে যে বেঠোভেনের ছবি আছে অনেক সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা করলে তাকে দর্শনযোগ্য মনে না

হতে পারে, কিন্তু আমি যখন তার দিকে চাই সে আমাকে খুব টেনে নিয়ে যায়— ঐ উস্কোখুস্কো মাথাটার ভিতরে কত বড়ো একটা শব্দহীন শব্দজগৎ! এবং কী একটা বেদনাময় অশান্ত ক্লিষ্ট প্রতিভা রুদ্ধ ঝড়ের মতো ঐ লোকটার ভিতরে ঘূর্ণ্যমান হত!

৯৮

পতিসর
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

মাঝে মাঝে মেঘ করছে, মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, থেকে থেকে হঠাৎ হুহু ক'রে একটা হাওয়া এসে আমার বোটের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচিত্র ক্যাঁ-কোঁঃ শব্দে আর্তনাদ তুলছে— আজ দুপুর বেলাটা এমনি ভাবে চলছে।

এখন বেলা একটা বেজেছে। পাড়াগেঁয়ে মধ্যাহ্নের এই হাঁসের ডাক, কাপড় কাচার শব্দ, নৌকো-চলা জলের ছল্‌ছল্‌ ধ্বনি, দূরে গোরুর পাল পার করবার হৈহৈ রব এবং আপনার মনের ভিতর-কার একটা উদাস আলস্যপূর্ণ স্বগত সংগীতস্বর, কলকাতার চৌকি-টেবিল-সমাকীর্ণ বর্ণবৈচিত্র্যবিহীন নিত্যনৈমিত্তিকতার মধ্যে কল্পনাও করতে পারি নে। কলকাতাটা বড়ো ভদ্র এবং বড়ো ভারী, গবর্মেণ্টের আপিসের মতো। জীবনের প্রত্যেক দিনটাই যেন একই আকারে একই ছাপ নিয়ে টাঁকশাল থেকে তক্‌তকে হয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আসছে— নীরস মৃত দিন, কিন্তু খুব ভদ্র এবং সমান ওজনের। এখানে আমি দলছাড়া এবং এখানকার প্রত্যেক দিন আমার নিজের দিন— নিত্যনিয়মিত-দম-দেওয়া কলের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার আপনার মনের ভাবনাগুলি এবং অখণ্ড অবসরটিকে হাতে করে নিয়ে মাঠের মধ্যে বেড়াতে যাই— সময় কিম্বা স্থানের মধ্যে কোনো বাধা নেই। সন্ধেটা জলে স্থলে আকাশে ঘনিয়ে আসতে থাকে— আমি মাথাটা নিচু করে আস্তে আস্তে বেড়াতে থাকি।

৯৯

পতিসর

শুক্রবার রাত্রি। ১৭ মার্চ ১৮৯৪

জ্যোৎস্না প্রতি রাত্রেই অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে। আমি তাই আজকাল সন্ধের পরেও অনেক ক্ষণ বাইরে বেড়াই। নদীর এ পারের মাঠে কোথাও কিছু সীমাচিহ্ন নেই, গাছপালা নেই, চষা মাঠে একটি ঘাসও নেই, কেবল নদীর ধারের ঘাসগুলো প্রখর রৌদ্রে শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে। জ্যোৎস্নায় এই ধূ ধূ শূন্য মাঠ ভারী অপূর্ব দেখতে হয়। সমুদ্র এই রকম অসীম বলে মনে হয়, কিন্তু তার একটা অবিশ্রাম গতি এবং শব্দ আছে— এই মাটির সমুদ্রের কোথাও কিছু গতি নেই, শব্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই, প্রাণ নেই— ভারী একটা উদাস মৃত শূন্যতা। চলবার মধ্যে কেবল এক প্রান্তে আমি একটি প্রাণী চলছি এবং আমার পায়ের কাছে একটি ছায়া চলে বেড়াচ্ছে। বহু দূরের মাঠে এক-এক জায়গায়, যেখানে গত শস্যের শুকনো গোড়া কিছু অবশিষ্ট ছিল, সেইখানে চাষারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে; মাঝে মাঝে কেবল সেই আগুনের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড বিস্তারিত প্রাণহীনতার উপর যখন অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন যেন একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদশোকের ভাব মনে আসে; যেন একটি মরুময় বৃহৎ গোরের উপরে একটি সাদা-কাপড়-পরা মেয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে মূর্ছিতপ্রায় নিস্তব্ধ পড়ে রয়েছে।

১০০

পতিসর

২৪ মার্চ ১৮৯৪

আজকাল আমার সন্ধ্যাভ্রমণের একমাত্র সঙ্গীটির অভাব হয়েছে। সেটি আর কেউ নয়, আমাদের শুক্লপক্ষের চাঁদ। কাল থেকে আর তাঁর দেখা নেই। ভারী অসুবিধে হয়েছে, শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে যায়, যথেষ্ট বেড়াবার পক্ষে একটু ব্যাঘাত জন্মায়।

আজকাল ভোরের বেলায় চোখ মেলেই ঠিক আমার খোলা জানলার সামনেই শুকতারা দেখতে পাই— তাকে আমার ভারী মিষ্টি লাগে— সেও আমার দিকে চেয়ে থাকে, যেন বহু কালের আমার আপনার লোক। মনে আছে, যখন শিলাইদহে কাছারি ক'রে সন্ধে-বেলায় নৌকো করে নদী পার হতুম, এবং রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম, আমার ভারী একটা সান্ত্বনা বোধ হ'ত। ঠিক মনে হ'ত, আমার নদীটি যেন আমার ঘর সংসার এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী— আমি কখন কাছারি থেকে ফিরে আসব এই জন্যে সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কাছ থেকে এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম! তখন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকত, বাতাসটি ঠাণ্ডা, কোথাও কিছু শব্দ নেই, ভারী যেন একটা ঘনিষ্ঠতার ভাবে আমার সেই প্রশান্ত সংসারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। আমার সেই শিলাইদহে প্রতি সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা খুব স্পষ্টরূপে প্রায়ই মনে পড়ে। ভোরের বেলায় প্রথম দৃষ্টিপাতেই শুকতারাটি দেখে তাকে আমার একটি বহুপরিচিত সহাস্য সহচরী না মনে করে থাকতে পারি নে; সে যেন একটি চিরজাগ্রত কল্যাণ-কামনার মতো ঠিক আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফুল্ল স্নেহ বিকিরণ করতে থাকে।

আজ বেড়িয়ে বোটে ফিরে এসে দেখি, বাতির কাছে এত বেশি পতঙ্গের ভিড় হয়েছে যে টেবিলে বসা অসাধ্য। আজ তাই বাতি নিবিয়ে দিয়ে বাইরে কেদারা নিয়ে অন্ধকারে বসেছিলুম ; আকাশের সমস্ত জ্যোতির্জগৎ, অনন্ত রহস্যের অন্তঃপুরবাসিনী সমস্ত মেয়ের দলের মতো উপরের তলার খড়খড়ি থেকে আমাকে দেখছিল, আমি তাদের কিছুই জানি নে এবং কোনো কালে জানতে পাব কিনা তাও জানি নে— অথচ ঐ জ্যোতির্ময়গুলীর মধ্যে বিচিত্র জীবনের অনন্ত ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আজ সন্ধের সময় আর চিঠি লেখা হয়ে ওঠে নি, তাই এখন লিখছি। এখন কত রাত হবে? এগারোটা। যখন চিঠিটা পৌঁছবে তখন দিনের বেলাকার প্রখর আলোকে জগৎটা খুবই সজাগ চঞ্চল, নানান কাজে ব্যস্ত ; তখন কোথায় এই সুষুপ্ত নিস্তব্ধ রাত্রি, কোথায় ঐ অনন্ত বিশ্বলোকের জ্যোতির্ময় শব্দহীন বার্তা! এত সুতীব্র প্রভেদ। কিছুতে ঠিক ভাবটি আনা যায় না! মানুষের মনের ক্ষমতা এত সামান্য। যে খুবই পরিচিত, চোখ বুজে তার আকৃতির প্রত্যেক রেখাটি মনে আনা যায় না— এক সময় যা সর্বপ্রধান আর-এক সময় তা যথার্থরূপে স্মৃতিগম্য করাও শক্ত হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় রাতকে ভুলি, রাতের বেলায় দিনকে ভুলি।

চাঁদের খণ্ড অনেক ক্ষণ হল উঠেছে ; চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ নিদ্রিত ; কেবল গ্রামের গোটাছুই কুকুর ও পার থেকে ডাকছে ; আমার এই বোটে কেবল একটি বাতি জ্বলছে, আর-সব জায়গায় আলো নিবেছে ; নদীতে একটু গতিমাত্র নেই, তাতেই মনে হয় মাছগুলো রাত্তিরে ঘুমোয়। জলের ধারে সুপ্ত গ্রাম এবং জলের উপর গ্রামের সুপ্ত ছায়া!

পতিসর
২২ মার্চ ১৮৯৪

'পশুপ্রীতি' বলে ব— একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে; আজ সমস্ত সকালবেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম। কাল আমি বোটে বসে জানলার বাইরে নদীর দিকে চেয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ দেখি, একটা কী পাখি সাঁৎরে তাড়াতাড়ি ও পারের দিকে চলে যাচ্ছে আর তার পিছনে মহা ধর্‌-ধর্‌ মার্‌-মার্‌ রব উঠেছে। শেষকালে দেখি একটি মুরগি; তার আসন্ন মৃত্যুকালে বাবুর্চিখানার নৌকো থেকে হঠাৎ কী রকমে ছাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল; ঠিক যেই তীরের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে অমনি যমদূত মানুষ কঁ্যাক করে তার গলা টিপে ধ'রে আবার নৌকো করে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি ফটিককে ডেকে বললুম, আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ব—র পশুপ্রীতি লেখাটা এসে পৌঁছল— আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হলুম। আমার তো আর মাংস খেতে রুচি হয় না। আমরা যে কী অন্যায় এবং নিষ্ঠুর কাজ করি তা ভেবে দেখি নে ব'লে মাংস গলাধঃকরণ করতে পারি। পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যার দূষণীয়তা মানুষের স্বহস্তে গড়া, যার ভালোমন্দ— অভ্যাস প্রথা দেশাচার লোকাচার সমাজনিয়মের উপর নির্ভর করে। কিন্তু, নিষ্ঠুরতা সেরকম নয়, এটা একেবারে আদিম দোষ; এর মধ্যে কোনো তর্ক নেই, কোনো দ্বিধা নেই; হৃদয় যদি আমাদের অসাড় না হয়, হৃদয়কে যদি চোখ বেঁধে অন্ধ করে না রেখে দিই, তা হলে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নিষেধ একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাই। অথচ ওটা আমরা হেসে-খেলে সকলে মিলে খুব অনায়াসে আনন্দ-সহকারে করে থাকি, এমন কি যে না করে তাকে কিছু অদ্ভুত বলে মনে

হয়। পাপপুণ্য সম্বন্ধে মানুষের এমনি একটা কৃত্রিম অপূর্ব ধারণা। আমার বোধ হয়, সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্বজীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। সেদিন একটা ইংরিজি কাগজে পড়লুম, পঞ্চাশ হাজার পৌণ্ড্ মাংস ইংলণ্ড্ থেকে আফ্রিকার কোনো এক সেনানিবাসে পাঠানো হয়েছিল; মাংসটা খারাপ হওয়াতে তারা ফিরে পাঠিয়ে দেয়; তার পরে সেই মাংস পোর্ট্স্মাউথে পাঁচ-ছ শো টাকায় নিলেম হয়ে যায়। ভেবে দেখো দেখি, জীবের জীবনের কী ভয়ানক অপব্যয় এবং কী অল্প মূল্য। আমরা যখন একটা খানা দিই তখন কত প্রাণী কেবলমাত্র ডিশ-পূরণের জন্যে আত্মবিসর্জন দেয়, হয়তো কেবল ফিরে ফিরে যায়, কেউ পাতে নেয় না। যত ক্ষণ আমরা অচেতনভাবে থাকি এবং অচেতনভাবে হিংসা করি তত ক্ষণ আমাদের কেউ দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যখন মনে দয়া-উদ্রেক হয় তখন যদি সেই দয়াটাকে গলা টিপে মেরে দশজনের সঙ্গে মিশে হিংস্রভাবে কাজ করে যাই, তা হলেই যথার্থ আপনার সমস্ত সাধুপ্রকৃতিকে অপমান করা হয়। আমি তো মনে করেছি, আরো একবার নিরামিষ খাওয়া ধরে দেখব।

আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে— আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি, যখনই সময় পাই সেই বইটা উল্টে-পাল্টে দেখি; ঠিক মনে হয়, তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি; এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা আছে এবং এই বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এই বইটি আমার মনের মতো। অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়, কোনোটা ঠিক আরামের বোধ হয় না— যেমন রোগের সময় অনেক সময় বিছানায় ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া

যায় না, নানা রকমে পাশ ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে; কখনো বালিশের উপর বালিশ চাপাই, কখনো বালিশ ফেলে দিই— সেই রকম মানসিক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়। আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে; ব—র লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি। কাদম্বরীর সেই মৃগয়াবর্ণনা থেকে অনেকটা আমি ব—কে তর্জমা করতে বলে দিয়েছি। পাখিরাও যে কতকটা আমাদেরই মতো, একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই, এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন।

১০২

পতিসর

২৮ মার্চ ১৮৯৪

এ দিকে গরমটাও বেশ পড়েছে, কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপটাকে আমি বড়ো একটা গ্রাহ্য করি নে। তপ্ত বাতাস ধুলোবালি খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে হুহু শব্দ করে ছুটেছে ; প্রায়ই হঠাৎ এক-এক জায়গায় একটা আজগবি ঘূর্ণিবাতাস দাঁড়িয়ে উঠে শুকনো পাতা এবং ধুলোর ওড়না ঘুরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নেচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে— সেটা দেখতে বেশ লাগে। নদীর ধারে বাগান থেকে পাখিগুলো ভারী মিষ্টি ক'রে ডাকছে ; মনে হচ্ছে, ঠিক বসন্তই বটে, তপ্ত খোলা থেকে একেবারে গরম গরম নাবিয়ে এনেছে ; কিন্তু গরমটা পরিমাণে কিঞ্চিৎ বেশি, আর-একটুখানি জুড়িয়ে আনলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না। আজ সকাল বেলাটায় হঠাৎ দিব্যি ঠাণ্ডা পড়েছিল ; এমন-কি, প্রায় শীতকালেরই মতো, স্নান করবার সময় মনে খুব প্রবল উৎসাহ ছিল না। এই প্রকৃতি-নামক একটা বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কখন যে কী হচ্ছে তার হিসেব পাওয়া শক্ত ; কোথায় তার কোন্ অজ্ঞাত কোণে কী একটা কাণ্ড ঘটছে আর অকস্মাৎ চার দিকের সমস্ত ভাবখানা বদলে যাচ্ছে। আমি কাল ভাবছিলুম, মানুষের মনখানাও ঠিক ঐ প্রকাণ্ড প্রকৃতির মতো রহস্যময়। চতুর্দিকে শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতর কী-এক অবিশ্রাম ইন্দ্রজাল চলছে ; হুহুঃশব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে, স্নায়ুগুলো কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড উঠছে পড়ছে, আর এই রহস্যময়ী মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে। কোথা থেকে কখন কী হাওয়া আসে আমরা কিছুই জানি নে। আজ মনে করলুম, জীবনটা দিব্যি চালাতে পারব, বেশ বল আছে, সংসারের দুঃখযন্ত্রণাগুলোকে একেবারে ডিঙিয়ে চলে যাব ; এই ভেবে সমস্ত জীবনের প্রোগ্রামটি ছাপিয়ে এনে, শক্ত ক'রে

বাঁধিয়ে, পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত আছি। কাল দেখি, কোন্ অজ্ঞাত রসাতল থেকে আর-একটা হাওয়া দিয়েছে, আকাশের ভাবগতিক সমস্ত বদলে গেছে ; তখন আর মনে হয় না, এ দুর্যোগ কোনো কালে কাটিয়ে উঠতে পারব। এসবের উৎপত্তি কোন্‌খানে। কোন্ শিরার মধ্যে, স্নায়ুর মধ্যে, কী-একটা নড়্‌চড়্‌ হয়ে গেছে— মাঝের থেকে আমি আমার সমস্ত বলবুদ্ধি নিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি নে। নিজের ভিতরকার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারী ভয় হয় ; কী করতে পারব না-পারব কিছুই জোর করে বলতে পারি নে ; মনে হয়, কিছুই না জেনে আমি এ কী-একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সর্বদাই স্কন্ধে বহন করে নিয়ে বেড়াই, আয়ত্ত করতে পারি নে, অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারি নে ; জা৷ন নে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব— আমার স্কন্ধে এই ভয়ংকর রহস্য যোজনা করে দেবার কী প্রয়োজন ছিল? বুকের ভিতর কী হয়, শিরার মধ্যে কী চলছে, মস্তিষ্কের মধ্যে কী নড়ছে, কত কী অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘটছে— আমি দেখতেও পাচ্ছি নে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করছে না ; অথচ সবসুদ্ধ নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কর্তাব্যক্তির মতো মুখ করে মনে করছি, আমি একজন আমি! তুমি তো ভারী তুমি— তোমার নিজের কতটুকুই বা জানো তার ঠিক নেই। আমি তো অনেক ভেবেচিন্তে এইটুকু ঠিক করেছি, আমি নিজেকে কিছুই জানি নে। আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো ; ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কলবল আছে, কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানি নে, কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত। কেবল কী বাজে সেইটেই জানি— সুখ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে, এইটুকুই বুঝতে পারি। আর জানি, আমার অক্টেভ নীচের দিকেই বা কত দূর, উপরের দিকেই বা কত দূর।... না, তাও কি ঠিক জানি!

পতিসর

৩০ মার্চ ১৮৯৪

এত অকারণ আশঙ্কা এবং কষ্ট মানুষের অদৃষ্টে থাকে! ছোটোবড়ো এত সহস্র বিষয়ের উপর আমাদের মনের সুখশান্তি নির্ভর করে! অনেক দুঃখ আছে যা আমার নিজকৃত এবং যা সবিনয়ে সহিষ্ণুভাবে বহন করা কর্তব্য মনে হয়; কিন্তু চিঠি না পেয়ে যখন আশঙ্কা হয় যে, বুঝি একটা-কিছু বিপদ কিম্বা ব্যামো হয়েছে, তখন কষ্টটাকে শান্ত করবার জন্যে হাতের কাছে কোনো ফিলজফিই পাওয়া যায় না। তখন বুদ্ধিটাও একেবারে কাজের বার হয়ে যায়। কাল সমস্ত ক্ষণ বেড়াতে বেড়াতে এমন-সকল অসম্ভব এবং অসংগত কল্পনা মনে উদয় হচ্ছিল এবং বুদ্ধি তার কোনো প্রতিবাদ করছিল না যে, আজ তা স্মরণ ক'রে হাসিও পাচ্ছে, লজ্জাও বোধ হচ্ছে— অথচ স্থির নিশ্চয় জানি যে, আসছে বারে যেদিন এইরকম ঘটনা হবে ঠিক আবার এরই পুনরাবৃত্তি হবে। আমিও অনেকবার বলেছি, বুদ্ধিটা মানুষের নিজস্ব জিনিস নয়, ওটা এখনো আমাদের মনের মধ্যে ন্যাচরলাইজড হয়ে যায় নি।

যখন মনে করি, জীবনের পথ সুদীর্ঘ, দুঃখকষ্টের কারণ অসংখ্য এবং অবশ্যম্ভাবী, তখন এক-এক সময় মনের বল রক্ষা করা প্রাণপণ কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় সন্ধের সময় একলা ব'সে ব'সে টেবিলের বাতির আলোর দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট করে মনে করি, জীবনটাকে বীরের মতো অবিচলিতভাবে নীরবে এবং বিনা অভিযোগে বহন করব; সেই কল্পনায় মনটা উপস্থিতমত অনেকখানি স্ফীত হয়ে ওঠে এবং আপনাকে হাতে হাতে একজন মস্ত বীরপুরুষ বলে ভ্রম হয়; তার পরে পথ চলতে পায়ে যেই কুশের কাঁটাটি ফোটে অমনি যখন লাফিয়ে উঠি তখন ভবিষ্যতের পক্ষে ভারী সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন আবার জীবন-

টাকে সুদীর্ঘ এবং আপনাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে হয়। কিন্তু সে যুক্তিটা বোধ হয় ঠিক নয়; বাস্তবিক, বোধ হয় কুশের কাঁটায় বেশি অস্থির করে। মনের ভিতরে একটি গোছালো গিন্নিপনা দেখা যায়— সে দরকার বুঝে ব্যয় করে, সামান্য কারণে বলের অপব্যয় করতে চায় না। সে যেন বড়ো বড়ো সংকট এবং আত্মত্যাগের জন্যে আপনার সমস্ত বল কৃপণের মতো সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে। ছোটো ছোটো বেদনায় হাজার কান্নাকাটি করলেও তার রীতিমত সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু, যেখানে দুঃখ গভীরতম সেখানে তার আলস্য নেই। এই জন্যে জীবনে একটা প্যারাডক্স্ প্রায়ই দেখা যায় যে, বড়ো দুঃখের চেয়ে ছোটো দুঃখ যেন বেশি দুঃখকর। তার কারণ, বড়ো দুঃখে হৃদয়ের যেখানটা বিদীর্ণ হয়ে যায় সেইখান থেকেই একটা সান্ত্বনার উৎস উঠতে থাকে; মনের সমস্ত দলবল, সমস্ত ধৈর্যবীর্য এক হয়ে আপনার কাজ করতে থাকে; তখন দুঃখের মাহাত্ম্যের দ্বারাই তার সহ্য করবার শক্তি বেড়ে যায়। মানুষের হৃদয়ে এক দিকে যেমন সুখলাভের ইচ্ছা তেমনি আর-এক দিকে আত্মত্যাগের ইচ্ছাও আছে; সুখের ইচ্ছা যখন নিষ্ফল হয় তখন আত্মত্যাগের ইচ্ছা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সেই ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধন করবার অবসর পেয়ে মনের ভিতরে একটা উদার উৎসাহ-সঞ্চার হয়। ছোটো দুঃখের কাছে আমরা কাপুরুষ কিন্তু বড়ো দুঃখ আমাদের বীর করে তোলে, আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে দেয়। তার ভিতরে একটা সুখ আছে। দুঃখের সুখ ব'লে একটা কথা অনেক দিন থেকে প্রচলিত আছে, সেটা নিতান্ত বাক্‌চাতুরি নয়— এবং সুখের অসন্তোষ একটা আছে, সেও সত্য। তার মানে বেশি শক্ত নয়। যখন আমরা নিছক সুখ ভোগ করতে থাকি তখন আমাদের মনের একার্ধ অকৃতার্থ থাকে, তখন একটা-কিছুর জন্যে দুঃখভোগ এবং

ত্যাগস্বীকার করতে ইচ্ছে করে, নইলে আপনাকে অযোগ্য বলে মনে হয়। এই কারণেই যে সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত সেই সুখই স্থায়ী এবং সুগভীর, তাতেই যথার্থ আমাদের সমস্ত প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধন হয়।... কিন্তু, সুখ-দুঃখের ফিলজফি ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগল।

শিলাইদহ

২৪ জুন ১৮৯৪

সবে দিন-চারেক হল এখানে এসেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন আছি তার ঠিক নেই। মনে হচ্ছে, আজই যদি কলকাতায় যাই তা হলে যেন অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাব।

আমিই কেবল সময়স্রোতের বাইরে একটি জায়গায় স্থির হয়ে আছি; আর, সমস্ত জগৎ আমার অজ্ঞাতে একটু একটু করে ঠাঁই বদল করছে। আসলে, কলকাতা থেকে এখানে এলে সময়টা চতুর্গুণ দীর্ঘ হয়ে আসে; কেবল আপনার মনোরাজ্যে বাস করতে হয়, সেখানে ঘড়ি ঠিক চলে না। ভাবের তীব্রতা-অনুসারে মানসিক সময়ের পরিমাপ হয়; কোনো কোনো ক্ষণিক সুখদুঃখ মনে হয় যেন অনেক ক্ষণ ধরে ভোগ করছি। যেখানে বাইরের লোকপ্রবাহ এবং বাইরের ঘটনা এবং দৈনিক কার্যপরম্পরা আমাদের সর্বদা সময়-গণনায় নিযুক্ত না রাখে সেখানে, স্বপ্নের মতো, ছোটো মুহূর্ত দীর্ঘ কালে এবং দীর্ঘ কাল ছোটো মুহূর্তে সর্বদাই পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই আমার মনে হয়, খণ্ড কাল এবং খণ্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম। প্রত্যেক পরমাণু অসীম এবং প্রত্যেক মুহূর্তই অনন্ত। এ সম্বন্ধে পারস্য উপন্যাসে খুব ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলুম, সেটা আমার ভারী ভালো লেগেছিল এবং তখন যদিও খুব ছোটো ছিলুম তবুও তার ভিতরকার ভাবটা এক রকম ক'রে বুঝতে পেরেছিলুম। কালের পরিমাণটা যে কিছুই নয় সেইটে দেখাবার জন্যে একজন ফকির একটা টবের মধ্যে মন্ত্রঃপূত জল রেখে বাদশাকে বললে, 'তুমি এর মধ্যে ডুব দিয়ে স্নান করো।' বাদশা ডুব দেবা মাত্র দেখলে সে এক সমুদ্রের ধারে নতুন দেশে গিয়ে উপস্থিত।

সেখানে সে দীর্ঘজীবন ধ'রে নানা ঘটনা নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে নানা সুখদুঃখ অতিবাহন করলে। তার বিয়ে হল, তার একে একে অনেকগুলি ছেলে হল, ছেলেরা মরে গেল, স্ত্রী মরে গেল, টাকাকড়ি সব নষ্ট হয়ে গেল— এবং সেই শোকে যখন সে একেবারে অধীর হয়ে পড়েছে এমন সময় হঠাৎ দেখলে, সে আপন রাজসভায় জলের টবের মধ্যে। ফকিরের উপর খুব ক্রোধ প্রকাশ করাতে সভাসদ্‌রা সকলেই বললে, 'মহারাজ, আপনি কেবলমাত্র জলে ডুব দিয়েই মাথা তুলেছেন।' আমাদের সমস্ত জীবনটা এবং জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ এইরকম এক মুহূর্তের মধ্যে বদ্ধ ; আমরা সেটাকে যতই সুদীর্ঘ এবং যতই সুতীব্র মনে করি, যেমনি সংসারের টব থেকে মাথা তুলব অমনি সমস্তটা মুহূর্তকালের স্বপ্নের মতো ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। কালের ছোটো বড়ো কিছুই নেই, আমরাই ছোটো বড়ো।

কাল দিনের বেলাটা বেশ ছিল। আমার এই নদীর জলরেখা, বালির চর এবং ও পারের বনদৃশ্যের উপরে মেঘ এবং রৌদ্রের মুহুর্মুহু নতুন খেলা চলছিল— খোলা জানলার ভিতর দিয়ে যে দিকেই চোখ পড়ছিল এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল। কোনো সুন্দর জিনিসকে 'স্বপ্নের মতো' কেন বলে ঠিক জানি নে, বোধ হয় নিছক সৌন্দর্যটা প্রকাশ করবার জন্যে। অর্থাৎ, ওর মধ্যে যেন REALITYর ভারটুকু মাত্র নেই। অর্থাৎ, এই শস্যক্ষেত্র থেকে যে আহার সংগ্রহ করতে হয়, এই নদী দিয়ে যে পাটের নৌকো যাবার রাস্তা, এই চর যে জমিদারের সঙ্গে খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত করে নিতে হয়, ইত্যাদি শত সহস্র কথা মন থেকে দূর করে দিয়ে কেবলমাত্র হিসাবহীন বিশুদ্ধ আনন্দময় সৌন্দর্যের ছবি যখন আমরা উপভোগ করি তখন আমরা সেটাকে 'স্বপ্নের মতো' বলি। অন্য সময়ে আমরা জগৎকে প্রধানতঃ সত্য বলে দেখি, তার পরে তাকে আমরা সুন্দর

অথবা অন্য রূপে জানি। কিন্তু যে সময়ে তাকে আমরা প্রধানত সুন্দর হিসাবে দেখি, তার পরে সত্য হোক না-হোক লক্ষ্য করি নে, তখন আমরা তাকে বলি 'স্বপ্নের মতো'।

শিলাইদহ

২৬ জুন ১৮৯৪

আজ সকালে বিছানা থেকে উঠেই দেখি পাংশুবর্ণ মেঘের ভারে আকাশ অন্ধকার এবং অবনত, বাদলার ভিজে হাওয়া দিচ্ছে, টিপ্ টিপ্ করে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ছে, নদীতে নৌকো বেশি নেই, ধান কাটবার জন্যে কাস্তে হাতে চাষারা মাথায় টোকা প'রে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে খেয়ানৌকোয় পার হচ্ছে, মাঠে গোরু চরছে না এবং ঘাটে স্নানার্থিনী জনপদবধূদের বাহুল্য নেই— অন্যদিন এতক্ষণ আমি তাদের উচ্চকণ্ঠের কলধ্বনি এ পার থেকে শুনতে পেতুম, আজ সে-সমস্ত কাকলী এবং পাখির গান নীরব। যে দিক থেকে বৃষ্টির ছাঁট আসবার সম্ভাবনা সে দিককার জানলা এবং পর্দা ফেলে দিয়ে অন্য দিককার জানলা খুলে আমি এত ক্ষণ কাজের প্রত্যাশায় বসে ছিলুম। অবশেষে ক্রমেই আমার ধারণা হচ্ছে, আজ এ বাদলায় আমলারা ঘরের বার হবে না— হায়, আমিও শ্যাম নই, তারাও রাধিকা নয়— বর্ষাভিসারের এমন সুযোগ মাঠে মারা গেল। তা ছাড়া, বাঁশি যদি বাজাতুম এবং রাধিকার যদি কিছুমাত্র সুর-বোধ থাকত তা হলে বৃকভানুনন্দিনী বিশেষ 'হর্ষিতা' হত না। যাই হোক, অবস্থাগতিকে যখন রাধিকাও আসছেন না, আমলারাও তদ্রূপ, এবং আমার Museও সম্প্রতি আমাকে পরিত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছেন, তখন বসে বসে একখণ্ড চিঠি লেখা যেতে পারে। আসল হয়েছে কি, এতক্ষণ কোনো কাজ না থাকাতে নদীর দিকে চেয়ে গুন্ গুন্ স্বরে ভৈরবী টোড়ি রামকেলি মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী সৃজন ক'রে আপন-মনে আলাপ করছিলুম, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল,

এমন একটা অনির্বচনীয় ভাবের আবেগ উপস্থিত হল, এক মুহূর্তের মধ্যেই আমার এই বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জগৎ আগাগোড়া এমন একটি মূর্তিপরিবর্তন করে দেখা দিলে, অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার এমন একটা সংগীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল, এবং সেই সুরের ছিদ্র দিয়ে নদীর উপর বৃষ্টিজলের তরল পতনশব্দ অবিশ্রাম ধ্বনিত হয়ে এমন একটা পুলক সঞ্চার করতে লাগল, জগতের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন একটিমাত্র প্রাণীকে ঘিরে আষাঢ়ের অশ্রুসজল ঘনঘোর শ্যামল মেঘের মতো 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা' এমনি স্তরে স্তরে ঘনিয়ে এল যে, হঠাৎ এক সময় বলে উঠতে হল যে, থাক্, আর কাজ নেই, এইবার Criticism on Contemporary Thought and Thinkers পড়তে বসা যাক।

১০৬

শিলাইদহ

২৭ জুন ১৮৯৪

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপি থট এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম, পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না ; কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনিই পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন যা হোক একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না ক'রে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবে-মাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে— হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারিশীকরবর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হল ; তাতে ক'রে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হল। তা হোক, তবু সে মনের মধ্যে আছে। দিনযাপনের আজ আর-এক রকম উপায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে। আজ বসে বসে ছেলেবেলাকার

স্মৃতি এবং তখনকার মনের ভাব খুব স্পষ্ট করে মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম। যখন পেনেটির বাগানে ছিলুম, যখন পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে প্রথমবার বোলপুরের বাগানে গিয়েছিলুম, যখন পশ্চিমের বারান্দার সবশেষের ঘরে আমাদের ইস্কুল-ঘর ছিল এবং আমি একটা নীল কাগজের ছেঁড়া খাতায় বাঁকা লাইন কেটে বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে প্রকৃতির বর্ণনা লিখতুম, যখন তোষাখানার ঘরে শীত-কালের সকালে চিন্তা ব'লে একটা চাকর গুন্‌গুন্‌ স্বরে মধুকানের সুরে গান করতে করতে মাখন দিয়ে রুটি তোষ করত— তখন আমাদের গায়ে গরম কাপড় ছিল না, একখানা কামিজ প'রে সেই আগুনের কাছে বসে শীত নিবারণ করতুম এবং সেই সশব্দবিগলিত-নবনী-সুগন্ধি রুটিখণ্ডের উপরে লুব্ধতৃরাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে চিন্তার গান শুনতুম— সেইসমস্ত দিনগুলিকে ঠিক বর্তমানের ক'রে দেখছিলুম এবং সেইসমস্ত দিনগুলির সঙ্গে এই রৌদ্রালোকিত পদ্মা এবং পদ্মার চর ভারী একরকম সুন্দরভাবে মিশ্রিত হচ্ছিল— ঠিক যেন আমার সেই ছেলেবেলাকার খোলা জানলার ধারে বসে এই পদ্মার একটি দৃশ্যখণ্ড দেখছি বলে মনে হচ্ছিল। তার পরে আমি ভাবলুম, এই তো আমি কোনো উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে এবং বর্তমানকে দূর কালের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে নিজেকে নিজে সুখী করতে পারি। তার পরেই মনে হল, প্রবাদ আছে: Nothing succeeds like success। টাকায় টাকা আনে, তেমনি সুখও সুখ আনে। সুখের সময়েই আমরা মনে করি, আমাদের সুখী হবার অসীম ক্ষমতা আছে; তার পরে দুঃখের সময়ে দেখতে পাই, কোনো ক্ষমতাই কোনো কাজ করছে না, সব কলই একেবারে বিগড়ে গেছে। কাল বোধ হয় একটু কিছু সুখের আভাস মনের ভিতর রীরী করে উঠেছিল, তাই সমস্ত কলগুলো একেবারে চলতে আরম্ভ

করেছিল, জীবনের অতীত স্মৃতি এবং প্রকৃতির বর্তমান শোভা একসঙ্গেই সজীব হয়ে উঠেছিল— তাই সকালে আজ জেগে উঠেই মনে হল, আমি কবি। যতই কবিত্ব থাক্, যতই ক্ষমতার গর্ব করি, মানুষ ভয়ানক পরাধীন। পৃথিবীর উপর থেকে এই কাঙাল জীবগুলো লম্বা হয়ে উঠে, খাড়া হয়ে, শীর্ণ হয়ে বেড়াচ্ছে— আস্ত স্বর্গটি চায়, তার পরে টুক্‌রোটাক্‌রা যা পায় তাতেই ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা করে— অবশেষে ভিক্ষাপ্রসারিত ঊর্ধ্বগামী দেহ ধুলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুকে স্বর্গপ্রাপ্তি বলে রটনা করে। যেটুকু সুখে জীবনের সমস্ত কলগুলো চলে সেইটুকু সুখ যদি চিরকাল ধরে রাখা যায় তা হলে সমস্ত শক্তি বিকশিত, সমস্ত কাজ সম্পন্ন ক'রে যাওয়া যেতে পারে। আজ গিরিবালা অনাহূত এসে উপস্থিত হয়েছেন, কাল বড়ো আবশ্যকের সময় তাঁর দোদুল্যমান বেণীর সূচ্যগ্রভাগটুকুও দেখা যাবে না। কিন্তু সে কথা নিয়ে আজ আন্দোলনের দরকার নেই। শ্রীমতী গিরিবালার তিরোধান-সম্ভাবনা থাকে তো থাক্, আজ যখন তাঁর শুভাগমন হয়েছে তখন সেটা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই।

এবারকার পত্রে অবগত হওয়া গেল যে, আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমাটি ক্ষুদ্র ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করতে শিখেছে। আমি সে চিত্র বেশ দেখতে পাচ্ছি। তার সেই নরম-নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে আমার মুখটা নাকটা তৃষার্ত হয়ে আছে। সে যেখানে-সেখানে আমাকে মুঠো ক'রে ধ'রে টল্‌মলে মাথাটা নিয়ে হাম ক'রে খেতে আসত এবং খুদে খুদে আঙুলগুলোর মধ্যে আমার চষমার হারটা জড়িয়ে নিতান্ত নির্বোধ নিশ্চিন্ত গম্ভীর ভাবে গাল ফুলিয়ে চেয়ে থাকত, সেই কথাটা মনে পড়ছে।

শিলাইদহ

৩০ জুন ১৮৯৪

আমার এই ক্ষুদ্র নির্জনতাটি আমার মনের কারখানাঘরের মতো ; তার নানাবিধ অদৃশ্য যন্ত্রতন্ত্র এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ চার দিকে ছড়ানো রয়েছে— কেউ যখন বাইরে থেকে আসেন তখন সেগুলি তাঁর চোখে পড়ে না— কখন কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই, দিব্য অজ্ঞানে হাস্যমুখে বিশ্বসংসারের খবর আলোচনা করতে করতে আমার অবসরের-তাঁতে-চড়ানো অনেক সাধনার সূক্ষ্ম সূত্র-গুলি পট্ পট্ করে ছিঁড়তে থাকেন। যখন স্টেশনে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আবার একাকী আমার কর্মশালায় ফিরে আসি তখন দেখতে পাই আমার কত লোকসান হয়েছে। অনেক কথা, অনেক কাজ, অনেক আলোচনা আছে যা অন্যের পক্ষে সামান্য এবং জনতার মধ্যে স্বাভাবিক, কিন্তু নির্জন জীবনের পক্ষে আঘাতজনক। কেননা, নির্জনে আমাদের সমস্ত গোপন অংশ, গভীর অংশ বাহির হয়ে আসে ; সুতরাং সেই সময়ে মানুষ বড়ো বেশি নিজেরই মতো, অর্থাৎ কিছু সৃষ্টিছাড়া গোছের হয়— সে অবস্থায় সে লোকসংঘের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। বাহ্যপ্রকৃতির একটা গুণ এই যে, সে অগ্রসর হয়ে মনের সঙ্গে কোনো বিরোধ করে না ; তার নিজের মন ব'লে কোনো বালাই না থাকাতে, মানুষের মনকে সে আপনার সমস্ত জায়গাটি ছেড়ে দিতে রাজি হয় ; সে নিয়ত সঙ্গদান করে, তবু সঙ্গ আদায় করে না ; সে অনন্ত আকাশ অধিকার ক'রে থাকে, তবু সে আমার এক তিল জায়গা জোড়ে না ; নির্বোধের মতো বকে না, সুবুদ্ধির মতো তর্ক করে না, আমার শিশুকন্যাটির মতো আকাশের কোলে শুয়ে থাকে— যখন শান্তভাবে থাকে সেও মিষ্টি লাগে, যখন গর্জন

ক'রে হাত পা ছুড়তে থাকে সেও মিষ্টি লাগে— বিশেষত যখন তার স্নান পান বেশপরিবর্তনের বন্দোবস্ত-ভার আমার উপর কিছুমাত্র নেই, তখন এই ভাষাহীন মনোহীন বিরাট সুন্দর শিশুটি আমার নির্জনের পক্ষে বেশ। ভাষায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ, বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ লোকালয়ের পক্ষেই উপাদেয়।

সাহাজাদপুরের পথে

[৭] জুলাই ১৮৯৪

সন্ধ্যাবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়াঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ও পার থেকে জনকতক লোক বাঁয়া-তবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এসে প্রবেশ করছে; রাস্তা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ যারা চলেছে তাদের ব্যস্ত ভাব; গাছপালার ভিতর দিয়ে দীপালোকিত কোঠাবাড়ি দেখা যাচ্ছে; খেয়াঘাটে নানাশ্রেণী লোকের ভিড়। আকাশে নিবিড় একটা এক-রঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ও পারে সার-বাঁধা মহাজনি নৌকোয় আলো জ্বলে উঠল, পূজাঘর থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগল— বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারী একটা অপূর্ব আবেগ উপস্থিত হল। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নীচে, নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে, কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য, মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষা-ঘেঁষি কত শতসহস্র প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত। বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালোমন্দ, সমস্ত সুখদুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর সুগম্ভীর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল। আমার 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখ -পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চলছে ও চলবে— নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই

চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই অবিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে; সবসুদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদি-অন্ত-শূন্য প্রশ্নোত্তরহীন মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে। এক-এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ হৃদয়ের মধ্যে পথ পায়— তার যে-একটা ধ্বনি শোনা যায় সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য।

১০৯

সাহাজাদপুরের পথে

৭ জুলাই ১৮৯৪

অদৃষ্টক্রমে এ নভেলটা নিতান্তই অপাঠ্য। কেবলমাত্র আরম্ভ করেছিলুম ব'লেই প্রাণপণে শেষ করে ফেললুম। আরম্ভ করেছি ব'লেই যে শেষ করতে হবে, এ কর্তব্যবোধের অর্থ বোঝা শক্ত। লোকেন যে বলে, আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির একটা অহংকার আছে, সেটা কতকটা ঠিক। তারা কেউ সহজে স্বীকার করতে চায় না, আমরা সামান্য বা ক্ষণস্থায়ী বাধাতেই পরাভূত ; এইজন্যে অনেক সময়ে তারা নিজেকে খুঁইয়ে খুঁইয়ে জাগিয়ে রাখে। আমাদের ইচ্ছাশক্তিরও একটা গর্ব আছে। সে একটা জিনিস নিয়ে আরম্ভ করেছে ব'লেই অবশেষে নিজের প্রতিকূলেও সেটা শেষ করতে চায়। সেই একগুঁয়ে অনাবশ্যক অহংকার-বশত একটা বাজে-বকুনি-ভরা অসংলগ্ন প্রকাণ্ড অপাঠ্য গ্রন্থ একটি দীর্ঘ বর্ষাদিনে বদ্ধ ঘরে বসে শেষ করে ফেললুম— শেষ করবার মহৎ সুখ ছাড়া আর কোনো সুখ পেলুম না।

সাহাজাদপুর
১০ জুলাই ১৮৯৪

ভালো করে ভেবে দেখলে হাসি পায় যে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ইহজীবনে ছুটো মানুষে কতটুকু অংশ রেখায় রেখায় সংলগ্ন। যাকে দশ বছর জানি তাকে দশটা বছরের কত সুদীর্ঘ অংশই জানি নে; বোধ করি আজীবন সম্পর্কেরও জমাখরচ হিসাব করলেও তেমন বড়ো অঙ্ক হাতে থাকে না। সে কথা ভেবে দেখলে সবাইকেই অপরিচিত বলে বোধ হয়; তখন বুঝতে পারি, খুব বেশি পরিচয় হবার কথা নেই, কেননা ছু দিন পরে বিচ্ছিন্ন হতেই হবে। আমাদের পূর্বে কোটি কোটি লোক এই সূর্যালোকে, নীলাকাশের নীচে, জীবনের পান্থশালায় মিলেছে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে, বিস্মৃত হয়ে, অপসৃত হয়ে গেছে। এরকম ভেবে দেখলে কোনো কোনো প্রকৃতিতে বৈরাগ্যের উদয় হয়, কিন্তু আমার ঠিক উল্টোই হয়; আমার আরও বেশি ক'রে দেখতে, বেশি ক'রে জানতে ইচ্ছা করে। এই-যে আমরা কয়েকজন প্রাণী জড়-মহাসমুদ্রের বুদ্‌বুদের মতো ভেসে এক জায়গায় এসে ঠেকেছি, এই অপূর্ব সংযোগটুকুর মধ্যে যত বিস্ময়, যত আনন্দ, তা আবার শত যুগে গড়ে উঠবে কি না সন্দেহ। তাই কবি বসন্তরায় লিখছেন—

নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।

বাস্তবিক, মানুষের এক নিমেষের মধ্যে শত যুগেরই সংযোগ-বিয়োগ তো ঘটে। এবারে চ'লে আসবার আগে যেদিন একদিন ছুপুর বেলায় স— পার্ক্ স্ট্রীটে এসেছিলেন, পিয়ানো বাজছিল, আমি গান গাবার উদ্যোগ করছিলুম, হঠাৎ এক সময়ে সকলের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, অনন্তকালের অসীম ঘটনাপরম্পরার মধ্যে

এই একটুখানি আশ্চর্য ব্যাপার। মনে হল, এর মধ্যে যেটুকু সৌন্দর্য ও আনন্দ আছে এবং এই-যে খোলা জানলা দিয়ে মেঘলা আকাশের আলোটুকু আসছে, এ একটা অসাধারণ লাভ। প্রাত্যহিক অভ্যাসের জড়ত্ব একদিন কেন যে একটুখানি ছিঁড়ে যায় জানি নে; তখন যেন সদ্যোজাত হৃদয় দিয়ে আপনাকে, সম্মুখবর্তী দৃশ্যকে, এবং বর্তমান ঘটনাকে অনন্তকালের চিত্রপটের উপরে প্রতিফলিত দেখতে পাই। অভ্যাসের একটা গুণ আছে যে, চারি দিকের অনেকগুলো জিনিসকে কমিয়ে এনে হাল্কা করে দেয়, বর্মের মতো আচ্ছন্ন করে বাইরের অতিশয় সংস্পর্শ থেকে মনকে রক্ষা করে। কিন্তু সেই অভ্যাস আমার মনে তেমন করে এঁটে ধরে না— পুরাতনকে বার বার নূতনের মতোই দেখি; সেই জন্যে অন্য লোকের সঙ্গে ক্রমশ আমার মনের perspective আলাদা হয়ে যায়, ভয়ে ভয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কে কোন্‌খানে আছি।

১১১

শিলাইদহ

৫ অগস্ট ১৮৯৪

কাল সমস্ত রাত্রি খুব অজস্রধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ ভোরে যখন উঠলুম তখনো অশ্রান্ত বৃষ্টি। এইমাত্র স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, পশ্চিম দিকে আউষধানের খেতের উপর খুব সজল শ্যামল অবনত মেঘ স্তূপে স্তূপে স্তরে স্তরে জমে রয়েছে এবং পূর্ব-দক্ষিণ দিকে মেঘ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে রৌদ্র ওঠবার চেষ্টা করছে— রৌদ্রে বৃষ্টিতে খানিক ক্ষণের জন্যে যেন সন্ধি হয়েছে। যে দিকে ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়ে সকাল বেলাকার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে সে দিকে অপার পদ্মা -দৃশ্যটি বড়ো চমৎকার হয়েছে। জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃপ্রতিমা উদিত হয়ে নীরব মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে ; আর ডাঙার উপরে কালো মেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মতো ভ্রূকুটি ক'রে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে বসে আছে— সে যেন একটি সুন্দরী দিব্যশক্তির কাছে হার মেনেছে, কিন্তু এখনো পোষ মানে নি, দিগন্তের এক কোণে আপনার সমস্ত রাগ এবং অভিমান গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে। এখনি আবার বৃষ্টি হবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ; রীতিমত শ্রাবণের বর্ষণের উপক্রম হচ্ছে। সুপ্তোত্থিত সহাস্য জ্যোতীরশ্মি যে মুক্ত দ্বারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই দ্বারটি আবার আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে আসছে ; পদ্মার ঘোলা জলরাশি ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে ; নদীর এক তীর থেকে আর-এক তীর পর্যন্ত মেঘের সঙ্গে মেঘ আবদ্ধ হয়ে সমস্ত আকাশ অধিকার করে নিয়েছে— খুব নিবিড় রকমের আয়োজনটা হয়েছে।

এত দিনে আউষধান এবং পাটের খেত শূন্যপ্রায় হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এবারে দেবতার গতিকে খেতের সমস্ত শস্য খেতেই আন্দোলিত হচ্ছে। দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে। বর্ষার আকাশ সজল মেঘে স্নিগ্ধ এবং পৃথিবী হিল্লোলিত শ্যাম শস্যে কোমলা; উপরে একটি গাঢ় রঙ এবং নীচেও একটি গাঢ় রঙের প্রলেপ; মাটি কোথাও অনাবৃত নয়, মাটির রঙটি কেবল এই ঘোলা নদীর জলের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। পদ্মা এক-একটি দেশ প্রদেশ বহন করে নিয়ে চলেছে— ওর জলের মধ্যেই কত জমিদারের জমিদারি গুলিয়ে রয়েছে। পদ্মা ভীষণ কৌতুকে এক রাজার রাজ্য হরণ ক'রে আপন গেরুয়া আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে অন্য রাজার দরজায় রাতারাতি থুয়ে আসছে— শেষে প্রাতঃকালে রাজায় রাজায় লাঠালাঠি, কাটাকাটি।

শিলাইদহ

৮ অগস্ট ১৮৯৪

একটিমাত্র মানুষ কেবলমাত্র সামনে উপস্থিত থাকলেই প্রকৃতির অর্ধেক কথা কানে আসে না। আমি দেখেছি, থেকে থেকে টুকরো টুকরো কথাবার্তা কওয়ার চেয়ে মানসিক শক্তির অপব্যয় আর কিছুতে হতে পারে না। দিনের পর দিন যখন একটি কথা না কয়ে কাটে তখন হঠাৎ টের পাওয়া যায়, আমাদের চতুর্দিকই কথা কচ্ছে। আজ নদীর কলধ্বনির প্রত্যেক তরলল'কার আমার সর্বাঙ্গে যেন কোমল আদর বর্ষণ করছে— মনটি আমার আজ অত্যন্ত নির্জন এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। মেঘমুক্ত আলোকে উজ্জ্বল শস্যহিল্লোলিত জলকল্লোলিত চতুর্দিক্‌টার সঙ্গে মুখোমুখি বিশ্রব্ধ প্রীতিসম্মিলনের উপযুক্ত একটি নীরব গোপনতা আমার মধ্যে স্থিরভাবে বিরাজ করছে। আমি জানি, আজ সন্ধ্যার সময় যখন কেদারা টেনে বোটের ছাতের উপর একলাটি বসব, তখন আমার আকাশে আমার সেই সন্ধ্যাতারাটি ঘরের লোকের মতো দেখা দেবে। আমি শীতের সময় যখন এই পদ্মাতীরে আসতুম, কাছারি থেকে ফিরতে অনেক দেরি হত। বোট ও পারে বালির চরের কাছে বাঁধা থাকত ; ছোটো জেলেডিঙি চড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম, তখন এই সন্ধ্যাটি সুগম্ভীর অথচ সুপ্রসন্নমুখে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন এবং সর্বদা গুপ্ত, সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে ; এখানকার দিনগুলো তার সেই অনেক দিনের পদচিহ্নের দ্বারা যেন অঙ্কিত।

শিলাইদহ

৯ অগস্ট ১৮৯৪

নদী একেবারে কানায় কানায় ভরে এসেছে। ও পারটা প্রায় দেখা যায় না। জল এক-এক জায়গায় টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, আবার এক-এক জায়গায় কে যেন অস্থির জলকে দুই হাত দিয়ে চেপে চেপে সমান করে মেলে দিয়ে যাচ্ছে। আজ দেখতে পেলুম, ছোটো একটি মৃত পাখি স্রোতে ভেসে আসছে— ওর মৃত্যুর ইতিহাস বেশ বোঝা যাচ্ছে। কোন্‌-এক গ্রামের ধারে বাগানের আম্রশাখায় ওর বাসা ছিল। সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরে এসে সঙ্গীদের নরম-নরম গরম ডানাগুলির সঙ্গে পাখা মিলিয়ে শ্রান্তদেহে ঘুমিয়ে ছিল। হঠাৎ রাত্রে পদ্মা একটুখানি পাশ ফিরেছেন অমনি গাছের নিচেকার মাটি ধসে পড়ে গেছে—নীড়চ্যুত পাখি হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে জেগে উঠল, তার পরে আর তাকে জাগতে হল না। আমি যখন মফস্বলে থাকি তখন একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে নিজের সঙ্গে অন্য জীবের প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর ব'লে উপলব্ধি হয়। শহরে মনুষ্য-সমাজ অত্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে; সেখানে সে নিষ্ঠুরভাবে আপনার সুখদুঃখের কাছে অন্য কোনো প্রাণীর সুখদুঃখ গণনার মধ্যেই আনে না। য়ুরোপেও মানুষ এত জটিল ও এত প্রধান যে, তারা জন্তুকে বড়ো বেশি জন্তু মনে করে। ভারতবর্ষীয়েরা মানুষ থেকে জন্তু ও জন্তু থেকে মানুষ হওয়াটাকে কিছুই মনে করে না; এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে সর্বভূতে দয়াটা একটা অসম্ভব আতিশয্য বলে পরিত্যক্ত হয় নি। মফস্বলে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হলে সেই আমার ভারতবর্ষীয় স্বভাব জেগে ওঠে। একটি পাখির সুকোমল পালকে আবৃত স্পন্দমান ক্ষুদ্র বক্ষটুকুর মধ্যে জীবনের আনন্দ যে কত প্রবল, তা আর আমি অচেতনভাবে ভুলে থাকতে পারি নে।

শিলাইদহ
১০ অগস্ট ১৮৯৪

কাল খানিক রাত্রে জলের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ একটা তুমুল কল্লোল এবং প্রবল চঞ্চলতা উপস্থিত হয়েছে। বোধ হয় অকস্মাৎ একটা নতুন জলের স্রোত এসে পড়েছে। রোজই প্রায় এই রকম ব্যাপার ঘটছে। বসে আছি আছি, হঠাৎ দেখতে পাই নদী ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌ ক'রে জেগে উঠেছে, আর সবসুদ্ধ খুব একটা ধুমধাম পড়ে গেছে। বোটের তক্তার উপর পা রাখলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, তার নীচে দিয়ে কত রকমের বিচিত্র শক্তি অবিশ্রাম চলছে ; খানিকটা কাঁপছে, খানিকটা টলছে, খানিকটা ফুলছে, খানিকটা আছাড় খেয়ে পড়ছে— ঠিক যেন আমি সমস্ত নদীর নাড়ির স্পন্দন অনুভব করছি। কাল অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ একটা চঞ্চল উচ্ছ্বাস এসে নাড়ির নৃত্য অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল। আমি অনেক ক্ষণ জানলার ধারে বেঞ্চের উপর বসে রইলুম। খুব এক রকম ঝাপসা আলো ছিল— তাতে ক'রে সমস্ত উতলা নদীকে আরো যেন পাগলের মতো দেখাচ্ছিল। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ। একটা খুব জ্বল্‌জ্বলে মস্ত তারার ছায়া দীর্ঘতর হয়ে জলের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত একটা জ্বালাময় বিদ্ধ বেদনার মতো থর্‌থর্‌ করে কাঁপছিল। নদীর দুই তীর অস্পষ্ট আলোকে এবং গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন অচেতন। মাঝখান দিয়ে একটা নিদ্রাহীন উন্মত্ত অধীরতা ভরপুর বেগে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে। অর্ধেক রাত্রে ঐ রকম দৃশ্যের মধ্যে জেগে উঠে বসে থাকলে আপনাকে এবং জগৎকে কী-এক নতুন রকমের মনে হয়— দিনের বেলাকার লোকসংসর্গের জগৎটা মিথ্যা হয়ে যায়। আবার আজ সকালে উঠে আমার সেই গভীর রাত্রের জগৎ স্বপ্নের মতো কত দূরবর্তী এবং লঘু হয়ে গেছে।

মানুষের পক্ষে দুটোই সত্য, অথচ দুটোই বিষম স্বতন্ত্র। আমার মনে হয়, দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সংগীত, সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা। আর, রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে, অথচ দুটোই পরস্পর-বিরোধী। কী করা যাবে! প্রকৃতির গোড়ায় একটা দ্বিধা একটা বিরোধ আছে; রাজা এবং রানীর মধ্যে সমস্ত বিভক্ত। দিন এবং রাত্রি, বিচিত্র এবং অখণ্ড, পরিব্যক্ত এবং অনাদি। আমরা ভারতবর্ষীয়েরা সেই রাত্রির রাজত্বে থাকি, আমরা অখণ্ড অনাদির দ্বারা অভিভূত। আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের সংগীত। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতি দিনের সুখদুঃখের সীমা থেকে বের ক'রে নিয়ে নিখিলের মূলে যে একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়, আর য়ুরোপের সংগীত মনুষ্যের সুখদুঃখের অনন্ত উত্থানপতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।

শিলাইদহ

১৩ অগস্ট ১৮৯৪

অহমিকার প্রভাবেই যে নিজের কথা বলতে চাই তা নয়। যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে তাকে প্রকাশ করে তোলাই তার স্বাভাবিক পরিণাম। ভিতরকার একটা শক্তি ক্রমাগতই সেই দিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা মনে হয় না, সে একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি। নিজের কাজের মাঝখানে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত আর-একটি পদার্থ এসে তারই স্বভাবমত কাজ করে। সেই শক্তির হাতে আত্মসমর্পণ করাই জীবনের আনন্দ। সে যে কেবল প্রকাশ করায় তা নয়, সে অনুভব করায়, ভালোবাসায়; সেই জন্যে অনুভূতি নিজের কাছে প্রত্যেকবার নূতন ও বিস্ময়জনক। নিজের শিশুকন্যাকে যখন ভালো লাগে তখন সে বিশ্বের মূল রহস্য, মূল সৌন্দর্যের অন্তর্বর্তী হয়ে পড়ে এবং স্নেহ-উচ্ছ্বাস উপাসনার মতো হয়ে আসে। আমার বিশ্বাস, আমাদের প্রীতি মাত্রই রহস্যময়ের পূজা; কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি। ভালোবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বের অন্তরতম একটি শক্তির সজাগ আবির্ভাব, যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি। নইলে ওর কোনো অর্থই থাকে না। বিশ্বজগতে সর্বব্যাপী আকর্ষণশক্তি যেমন, ছোটো বড়ো সর্বত্রই তার যেমন কাজ, অন্তরজগতে সেইরকম একটা বিশ্বব্যাপী আনন্দের আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণেই আমরা বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্য ও হৃদয়ের মধ্যে প্রেম অনুভব করি; জগতের ভিতরকার সেই অনন্ত আনন্দের ক্রিয়া আমাদের মনের ভিতরেও কার্য করে। আমরা সেটাকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখি তবে তার

যথার্থ কোনো অর্থ থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে আমরা কেন আনন্দ পাই তার একটি মাত্র সদুত্তর হচ্ছে : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

শিলাইদহ
১৬ অগস্ট ১৮৯৪

এখন শুক্লপক্ষ কিনা, বেড়াবার সময় চমৎকার জ্যোৎস্না পাই। আমার দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ মাঠ, মাঝে মাঝে আউষ ধান, এক প্রান্ত দিয়ে একটি সংকীর্ণ মেঠো রাস্তা, সম্মুখে পূর্বদিকে হাটের গোলাঘর,সামনে স্তূপাকার খড় জমা রয়েছে— জ্যোৎস্নায় সমস্ত ছবির মতো দেখাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলাটি আমার মাথার উপর, আমার চোখের সামনে, আমার পায়ের তলায়, আমার চতুর্দিকে এমন সুন্দর, এমন শান্তিময়, এমন মানুষটির মতো নিবিড়ভাবে আমার নিকটবর্তী হয়ে আসে যে, আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে আর পদ্মার সুদূর ছায়াময়ী তীররেখা পর্যন্ত সমস্তটি একটি নিভৃত গোপন গৃহের মতো ছোটো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়; আমার মধ্যে যে দুটি প্রাণী আছে, বাইরের আমি এবং আমার অন্তঃপুরবাসী আত্মা,এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল ক'রে ব'সে থাকি; এই দৃশ্যের মধ্যগত সমস্ত পশু পক্ষী প্রাণী আমাদের অন্তর্গত হয়ে যায়; কানে জলের কলশব্দ আসতে থাকে— মুখের উপর, মাথার উপর জ্যোৎস্নার শুভ্রহস্ত আদরের স্পর্শ করতে থাকে, আকাশে চকোর পাখি ডেকে চলে যায়, জেলের নৌকো পদ্মার মাঝখানে খরস্রোতের উপর দিয়ে বিনা চেষ্টায় অনায়াসে পিছলে বহে যেতে থাকে, আকাশব্যাপী স্নিগ্ধরাত্রি আমার রোমে রোমে প্রবেশ ক'রে ধীরে ধীরে উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়— চোখ বুজে, কান পেতে, দেহ প্রসারিত ক'রে প্রকৃতির একমাত্র যত্নের জিনিসের মতো পড়ে থাকি, তার সহস্র সহচরী আমার সেবা করে। মনের কল্পনাও তার দুটি হস্তে থালা সাজিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়; মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে তার কোমল অঙ্গুলির স্পর্শ আমার চুলের মধ্যে অনুভব করি।

শিলাইদহ

১৯ অগস্ট ১৮৯৪

এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি। তাতে গুটি তিনেক সংস্কৃত বেদান্তগ্রন্থ ও তার অনুবাদ আছে। তার থেকে আমার অনেক সাহায্য হয়েছে। বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন, কিন্তু আমার সংশয় দূর হয় না। এক হিসাবে অন্য অনেক মত অপেক্ষা বেদান্তমত সরল। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা কথাটা শুনতে সহজ কিন্তু অমন সমস্যা আর নেই। বেদান্ত তারই একেবারে গর্ড্যান-গ্রন্থি ছেদন ক'রে বসে আছেন— সমস্যাটাকে একেবারে আধখানা ছেঁটেই ফেলেছেন। সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরাও নেই, আছেন কেবল ব্রহ্ম, আর মনে হচ্ছে যেন আমরা আছি। আশ্চর্য এই, মানুষ মনে এ কথা স্থান দিতে পারে। আরও আশ্চর্য এই, কথাটা শুনতে যত অসংগত আসলে তা নয়— বস্তুত কিছুই যে আছে সেইটে প্রমাণ করাই শক্ত। যাই হোক, আজকাল সন্ধ্যাবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে এবং আমি যখন অর্ধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি, স্নিগ্ধ সমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই জল স্থল আকাশ, এই নদীকল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধজন পথিক ও জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধখানা জেলেডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত, দূরে অন্ধকারজড়িত বনবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম— সমস্তই ছায়ারই মতো, মায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশি সত্য হয়ে জীবনমনকে জড়িয়ে ধরে, এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি এ কথা কিছুতেই মনে হয় না।

দার্শনিক বলতে পারেন, জগৎটাকে সত্য জ্ঞান করাতে দিনের বেলায় যে একটা দৃঢ় বন্ধনজাল থাকে, সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় ও সৌন্দর্যময় হয়ে আসাতে সেই বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে। যখন জগৎটাকে একেবারে নিছক মায়া ব'লেই নিশ্চয় জানব তখনই মুক্তির বাধা থাকবে না। এ কথাটা আমি অতি ঈষ—ৎ অনুমান এবং অনুভব করতে পারি; হয়তো কোন্ দিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।

কুষ্টিয়ার পথে
২৪ অগস্ট ১৮৯৪

পদ্মাকে এখন খুব জঁাকালো দেখতে হয়েছে— একেবারে বুক ফুলিয়ে চলেছে ; ও পারটা একটিমাত্র কাজলের নীল রেখার মতো দেখা যায়। আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ-পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা চলা খানিকটা না-চলা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে— সেই জন্যে আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের চেতনার সঙ্গে, তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিকভাবে পদচালনা করে, অঙ্গচালনা করে, আমাদের মনটার আগাগোড়াই চলেছে। সেই জন্যে এই ভাদ্রমাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয় ; সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে-চুরছে এবং চলেছে, মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসংগীতে নানা প্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মতো, আর বিচিত্রশস্যশালিনী স্থির ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো।

আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে। তীরটা এখন বামে পড়েছে। খুব নিবিড় প্রচুর সরস সবুজের উপর খুব ঘন নীল সজল মেঘরাশি মাতৃস্নেহের মতো অবনত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গুরুগুরু মেঘ ডাকছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষার যমুনা-বর্ণনা মনে পড়ে। প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়। তার প্রধান কারণ এই, প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয় ; এর মধ্যে একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে,

এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন। বৈষ্ণব পদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।

১১৯

সাহাজাদপুর

৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

অনেক কাল বোটের মধ্যে বাস ক'রে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড়ো ভালো লাগে। বড়ো বড়ো জানলা দরজা, চারি দিক থেকে আলো বাতাস আসছে, যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডালপালা চোখে পড়ে এবং পাখির ডাক শুনতে পাই, দক্ষিণের বারান্দায় কেবলমাত্র কামিনীফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ বুঝতে পারি, এতদিন বৃহৎ আকাশের জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষুধা ছিল, সেটা এখানে এসে পেট ভরে পূর্ণ ক'রে নেওয়া গেল। আমি চারটি বৃহৎ ঘরের একলা মালিক, সমস্ত দরজাগুলি খুলে বসে থাকি। এখানে যেমন আমার মনে লেখবার ভাব ও ইচ্ছা আসে এমন কোথাও না। বাইরের জগতের একটা সজীব প্রভাব ঘরে অবাধে প্রবেশ করে, আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সবুজহিল্লোলে এবং আমার মনের নেশায় মিশিয়ে কত গল্পের ছাঁচ তৈরি হয়ে ওঠে। বিশেষত এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখিদের, বিশেষত কাকের ডাক, এবং সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর— সবসুদ্ধ আমাকে উদাস ক'রে দেয়। কেন জানি নে মনে হয়, এই রকম সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ, সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, দামাস্ক্, সমর্‌কন্দ্, বুখারা— আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ— মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস— নগরের মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ বাজারের পথ,

পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড় -পরা দোকানি খর্মুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে— পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাব বিছানো— জরির চটি, ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলি -পরা আমিনা জোবেদি সুফি— পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো-কাপড়-পরা কালো হাব্‌ষি পাহারা দিচ্ছে —এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্য-ময় ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকান্না আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কত শতসহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে। আমার এই সাজাদপুরের দুপুর বেলা গল্পের দুপুর বেলা। মনে আছে, ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে ব'সে আপনার মনে ভোর হয়ে পোস্ট্‌মাস্টার গল্পটা লিখেছিলুম। আমিও লিখছিলুম এবং আমার চার দিকের আলো বাতাস ও তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ ক'রে দিচ্ছিল। এই রকম চতুর্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মতো একটা কিছু রচনা ক'রে যাওয়ার যে সুখ তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে। আজ সকালে ব'সে 'ছড়া' সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম ; বড়ো ভালো লাগছিল। ছড়ার রাজ্যে আইনকানুন নেই, মেঘরাজ্যের মতো। দুর্ভাগ্যক্রমে যে রাজ্যেই থাকি আইনকানুনের বৈষয়িক রাজ্যকে বাধা দেবার জো নেই ; আমার লেখার মাঝখানে তারই একটা উপদ্রব উপস্থিত হল, আমার মেঘের ইমারত উড়িয়ে দিলে। এইসব ব্যাপারে আহারের সময় এসে পড়ল। দুপুর বেলায় পেট ভ'রে খাওয়ার মতো এমন জড়ত্বজনক আর কিছুই নেই। আমরা বাঙালিরা কষে মধ্যাহ্ন-ভোজন করি ব'লেই মধ্যাহ্নটাকে হারাই। দরজা বন্ধ ক'রে তামাক খেতে খেতে, পান চিবোতে চিবোতে, পরিতৃপ্ত নিদ্রার আয়োজন হতে

থাকে ; তাতেই আমরা বেশ চিক্‌চিকে গোলগাল হয়ে উঠি। অথচ বাংলাদেশের বৈচিত্র্যহীন সুদূরপ্রসারিত সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন যেমন গভীরভাবে বৃহৎ ভাবে বিস্তীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না।

১২০

পতিসর

১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

ভাদ্রমাসের দিন, বাতাস বেশি নেই, বোটের শিথিল পাল ঝুলে ঝুলে পড়ছে— নৌকোটি আলস্যমন্থর গমনে অত্যন্ত উদাসীনের মতো চলেছে। এই শৈবালবিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্রে আমি জানলার কাছে এক চৌকিতে বসে আর-এক চৌকির উপরে পা দিয়ে সমস্ত বেলা কেবল গুন্ গুন্ ক'রে গান করছি। রামকেলি প্রভৃতি সকাল বেলাকার সুরের একটু আভাস লাগবা মাত্র এমন একটি বিশ্বব্যাপী করুণা বিগলিত হয়ে চারি দিককে বাষ্পাকুল করছে যে এইসমস্ত রাগিণীকে সমস্ত আকাশের, সমস্ত পৃথিবীর নিজের গান ব'লে মনে হচ্ছে। এ একটা ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামন্ত্র। আমার এই গুন্-গুন্-গুঞ্জরিত সুরের সঙ্গে কত টুকরো টুকরো কথা যে আমি জুড়ি তার সংখ্যা নেই। এমন এক লাইনের গান সমস্ত দিন কত জমছে এবং কত বিসর্জন দিচ্ছি। এই চৌকিটাতে বসে আকাশ থেকে সোনালি রোদ্দুরটুকু চোখ দিয়ে চাখতে চাখতে এবং জলের উপরকার শৈবালের সরস কোমলতার উপর মনটাকে বুলিয়ে চলতে চলতে, যতটুকু অনায়াস আলস্য -ভরে আপনি মাথায় এসে পড়ে তার বেশি চেষ্টা করা আপাতত আমার সাধ্যাতীত। আজ সমস্ত সকাল নিতান্ত সাদাসিধা রামকেলিতে যে গোটা দুই-তিন ছত্র বারবার আবৃত্তি করছিলুম সেটুকু মনে আছে, নমুনাস্বরূপ উদ্‌ধৃত ক'রে দিলুম—

ওগো, তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে!—(আমার নিত্যনব!)
এসো গন্ধে বরনে গানে!
আমি যে দিকে নিরখি তুমি এসো হে আমার মুগ্ধমুদিত নয়ানে!

দিঘাপতিয়া জলপথে

২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

বড়ো বড়ো গাছ জলের মধ্যে সমস্ত গুঁড়িটি ডুবিয়ে দিয়ে শাখা প্রশাখা জলের উপর অবনত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমগাছ বটগাছের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর নৌকা বাঁধা, এবং তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গ্রামের লোকেরা স্নান করছে। এক-একটি কুঁড়েঘর স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চার পাশের প্রাঙ্গণ জলমগ্ন। ধানের খেতের ভিতর দিয়ে বোট সর্ সর্ শব্দে যেতে যেতে হঠাৎ কোনো জলাশয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ে; সেখানে নালবনের মধ্যে সাদা সাদা নালফুল ফুটে আছে, পানকৌড়ি জলের ভিতর ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরছে। জল যেখানে সুবিধা পাচ্ছে প্রবেশ করছে— স্থলের এমন পরাভব আর-কোথাও দেখা যায় না। আর-একটু জল বাড়লেই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করবে; তখন মাচা বেঁধে তার উপর বাস করতে হবে, গোরুগুলো দিনরাত একহাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে; রাজ্যের সাপ জলমগ্ন গর্ত ত্যাগ করে ঘরের চালে আশ্রয় নেবে এবং যেখানকার যত গৃহহীন কীটপতঙ্গ সরীসৃপ মানুষের সহবাস গ্রহণ করবে। যখন গ্রামের চারি দিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা-লতা-গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারি দিকে ভেসে বেড়ায়, পাট-পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েরা যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর

উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায়— তখন সে দৃশ্য কোনোমতেই ভালো লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না— এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়! সকল-রকম শক্তির কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধ'রে যে-সকল উপদ্রব ক'রে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।

১২২

বোয়ালিয়ার পথে
২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

যখন ভেবে দেখি এ জীবনে কেবলমাত্র ৩২টি শরৎকাল এসেছে এবং গেছে, তখন ভারী আশ্চর্য বোধ হয়। অথচ মনে হয়, আমার স্মৃতিপথ ক্রমশই অস্পষ্টতর হয়ে অনাদিকালের দিকে চলে গেছে এবং এই বৃহৎ মানসরাজ্যের উপর যখন মেঘমুক্ত সুন্দর প্রভাতের রৌদ্রটি এসে পড়ে তখন আমি যেন আমার এক মায়া-অট্টালিকার বাতায়নে বসে এক সুদূরবিস্তৃত ভাবরাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি এবং আমার কপালে যে বাতাসটি এসে লাগতে থাকে সে যেন অতীতের সমস্ত অস্পষ্ট মৃদু গন্ধপ্রবাহ বহন করে আনতে থাকে। আমি আলো ও বাতাস এত ভালোবাসি! গেটে মরবার সময় বলেছিলেন: More light! আমার যদি সে সময়ে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি: More light and more space! অনেকে বাংলাদেশকে সমতল ভূমি বলে আপত্তি প্রকাশ করে; কিন্তু সেই জন্যেই এ দেশের মাঠের দৃশ্য, নদীতীরের দৃশ্য আমার এত বেশি ভালো লাগে। যখন সন্ধ্যার আলোক এবং সন্ধ্যার শান্তি উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্তমণির পেয়ালার মতো আগাগোড়া পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, যখন স্তিমিত শান্ত নীরব মধ্যাহ্ন তার সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তখন কোথাও সে বাধা পায় না— চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভ'রে নেবার এমন জায়গা আর কোথায় আছে!

১২৩

বোয়ালিয়া
২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

আমি অনেক সময় ভেবে দেখেছি, সুখী হলুম কি দুঃখী হলুম সেইটে আমার পক্ষে শেষ কথা নয়। আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখদুঃখের ভিতরে নিজের একটা প্রসার অনুভব করতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে মাত্র, কিন্তু দুটো এক নয়, এ আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করি। আমাদের ক্ষণিক জীবনই সুখ দুঃখ ভোগ করে; আমাদের চির-জীবন সেই সুখ-দুঃখ নেয় না, তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে। গাছের পাতা প্রতিদিন রৌদ্রে প্রসারিত হয়ে শুষ্ক হয়ে ঝরে যাচ্ছে, আবার নূতন পাতা গজাচ্ছে; গাছের ক্ষণিকজীবন কেবল রৌদ্র ভোগ করছে এবং সেই উত্তাপেই শুকিয়ে পড়ে যাচ্ছে, আর গাছের চিরজীবন তার ভিতর থেকে দাহহীন চির-অগ্নি সঞ্চয় করছে। আমাদেরও প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্তের পল্লবরাশি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে জগতের সমস্ত প্রবহমান সুখদুঃখ ভোগ করছে এবং সেই সুখ-দুঃখের উত্তাপেই শুষ্ক হয়ে, দগ্ধ হয়ে, ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে; কিন্তু আমাদের চিরজীবনকে সেই প্রতি মুহূর্তের দাহ স্পর্শ করতে পারছে না, অথচ তার তেজটুকু সে ক্রমাগতই গ্রহণ করছে। যে মানুষের প্রতি মুহূর্তের সুখদুঃখ-ভোগ-শক্তি সামান্য, তার দাহও অল্প, তেমনি তার চিরপ্রাণের সঞ্চয়ও অকিঞ্চিৎকর। সুখদুঃখের তাপ থেকে সংরক্ষিত হয়ে তাদের ক্ষণিক জীবনটা অনেক দিন স্থির থাকে, তারা অচেতনতার আবরণে ক্ষণিককে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী করে রাখে; দু-দিনকে এমনি তাজা রেখে দেয় যে হঠাৎ মনে হয় তা চিরদিনের; সংসারের সামান্য ব্যাপারকে এমনি করে তোলে যেন তা অসামান্য।

বোয়ালিয়া

২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

আমরা যখন খুব বড়ো রকমের একটা আত্মবিসর্জন করি তখন কেন করি? একটা মহৎ আবেগে আমাদের ক্ষণিক জীবনটা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার সুখদুঃখ আমাদের আর স্পর্শ করতে পারে না। আমরা হঠাৎ দেখতে পাই, আমরা আমাদের সুখদুঃখের চেয়ে বড়ো, আমরা প্রতিদিনের তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্ত। সুখের চেষ্টা এবং দুঃখের পরিহার, এই আমাদের ক্ষণিক জীবনের প্রধান নিয়ম; কিন্তু এক-একটা সময় আসে যখন আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে, আমাদের ভিতরে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে সে নিয়ম খাটে না। তখন আমরা আমাদের ক্ষণিক জীবনটাকে পরাভূত ক'রেই একটা আনন্দ পাই, দুঃখকে গলার হার ক'রে নিয়েই মনে উল্লাস জন্মায়। তখন মনে হয়, অন্তরের সেই স্বাধীন পুরুষের বলেই সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে চিরকাল আমি আমার প্রকৃতির সফলতা সাধন করব। কিন্তু আবার চারি দিকের সংসারের জনতা, প্রতিদিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা, প্রবল হয়ে উঠে সেই অন্তরতম স্বাধীনতার ক্ষেত্রটিকে আমাদের চোখ থেকে ঢেকে ফেলে; তখন আত্মবিসর্জন সুকঠিন হয়ে ওঠে। আমি যখন একলা মফস্বলে থাকি তখন প্রকৃতির ভিতরকার আনন্দ আমার অন্তরের আনন্দনিকেতনের দ্বার খুলে দেয়; গানের সুরের দ্বারা গানের কথাগুলো যেমন অমরতা প্রাপ্ত হয় তেমনি প্রাত্যহিক সংসারটা অন্তরের চিরানন্দরাগিণীর দ্বারা চিরমহিমা লাভ করে; আমাদের সমস্ত স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ একটি বিনম্র ধর্মোপাসনার ভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে— দুঃখবেদনার দুঃখত্ব যে চলে যায় তা নয়,

কিন্তু সে যেন আমার নিজত্বের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম ক'রে এমন সুবৃহৎ আকাশে ব্যাপ্ত হয় যে সেখানে সে একটা সৌন্দর্য বিকিরণ করতে থাকে। এবার বোটে থাকতে আমি অন্তর্যামী-নামক একটি কবিতা লিখেছি, তাতে আমি আমার অন্তর-জীবনের কথা অনেকটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।

১২৫

কলিকাতা

৫ অক্টোবর ১৮৯৪

আজ সকালের বাতাসে অতি ঈষৎ শীতের সঞ্চার হয়েছে, একটুখানি শিউরে ওঠার মতো। কাল দুর্গোৎসব; আজ তার সুন্দর সূচনা। ঘরে ঘরে দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দ প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে আমার ধর্মসংস্কারের বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পরশুদিন স—র বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম, রাস্তার দু ধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান-মাত্রেই প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। দেখে আমার মনে হল, দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকয়েকের জন্যে ছেলেমানুষ হয়ে উঠে একটা বড়ো গোছের খেলায় লেগে গেছে। ভেবে দেখতে গেলে, আনন্দের আয়োজন মাত্রই পুতুলখেলা, অর্থাৎ তাতে আনন্দ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই— বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, সময় নষ্ট। কিন্তু সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে একটা ভাবের আন্দোলন এনে দেয় তা কি কখনো নিষ্ফল হতে পারে? সমাজের মধ্যে কত লোক আছে যারা নীরস বিষয়ী লোক; এই উৎসবে তাদেরও মন একটা সর্বব্যাপী ভাবের টানে বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে মিলে যায়। এমনি ক'রে প্রতি বৎসর কিছু কালের জন্যে মনের এমন একটি অনুকূল আর্দ্র অবস্থা আসে যাতে স্নেহ প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে; আগমনী-বিজয়ার গান, প্রিয়সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা, সমস্তটা মিলে মনের মধ্যে আনন্দকাব্য রচনা করে। ছেলেদের যে আনন্দ সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ। তারা তুচ্ছ উপলক্ষ্যকে নিয়ে নিজের মন দিয়ে ভরে তোলে, সামান্য কদাকার পুতুল নিয়ে

তাকে নিজের ভাব দিয়ে সুন্দর ও প্রাণ দিয়ে সজীব ক'রে তোলে। এই ক্ষমতাটা যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে সেই তো ভাবুক। তার কাছে চারি দিকের বস্তু কেবল বস্তু নয়, কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর— তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সংগীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। দেশের সমস্ত লোক ভাবুক হতেই পারে না, কিন্তু এই-রকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত অধিকাংশ লোকের মনকে অধিকার করে। তখন, যেটাকে দূরে থেকে সামান্য পুতুল ব'লে মনে হয়, কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে তার সে মূর্তি থাকে না।

কলিকাতা

৭ অক্টোবর ১৮৯৪

আমাদের যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে কেবল নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। সে আমাদের আয়ত্তের অতীত, তা আমাদের দানবিক্রয়ের ক্ষমতা নেই। মূল্য নিয়ে বিক্রি করতে চেষ্টা করলেই তার উপরকার আবরণটি কেবল পাওয়া যায়, আসল জিনিসটি হাত থেকে সরে যায়। নিজের যা সর্বোৎকৃষ্ট, ক'জনই বা তা নিজে ধরতে বা পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশিত হই ; ইচ্ছা করলে, চেষ্টা করলে, প্রকাশিত হতে পারি নে। চব্বিশ ঘণ্টা যাদের কাছে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। কারও কারও এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে যে, অন্যের ভিতরকার সত্যটিকে সে অত্যন্ত সহজেই টেনে নিতে পারে। সে তার নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে অন্তরের কথা তার চিঠিতে প্রকাশ পাচ্ছে তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।

১২৭

বোলপুর

১৯ অক্টোবর ১৮৯৪

কাল কেবল বিছানায় উপুড় হয়ে প'ড়ে একখানি ছোটো কবিতা লিখেছি এবং একটি তিব্বতভ্রমণের বই পড়েছি। এরকম জায়গায় নভেল আমি ছুঁতে পারি নে। এই জনশূন্য মাঠের মধ্যে, শালবনের বেষ্টনে সমস্ত-দরজা-খোলা জাজিম-পাতা দোতলার একলা ঘরে, পাখিদের করুণকলধ্বনিপূর্ণ স্বপ্নাবেশময় শরৎমধ্যাহ্নে বিলাতি নভেল কোনোমতেই খাপ খায় না। ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে অথচ প্লটের বন্ধন নেই— মনের একটি অবারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এখানকার জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি রাঙা রাস্তা চলে গেছে; সেই রাস্তা দিয়ে যখন দুই-চার জন লোক কিম্বা দুটো-একটা গোরুর গাড়ি মন্থর গমনে চলতে থাকে, তার বড়ো একটা টান আছে— মাঠ তাতে আরো যেন ধু ধু ক'রে ওঠে, মনে হয় এই মানুষগুলো যে কোথায় যাচ্ছে তার যেন কোনো ঠিকানা নেই। ভ্রমণবৃত্তান্তের বইও আমার এই মানসিক নিরালার মধ্যে সেই-রকম একটি গতিপ্রবাহের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত ক'রে দিয়ে চলে যেতে থাকে; তাতে ক'রে আমার মনের সুবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধ নির্জন আকাশটি আরো যেন বেশি ক'রে অনুভব করতে পারি।

বোলপুর

২৮ অক্টোবর ১৮৯৪

এখনো আটটা বাজে নি, তবু মনে হচ্ছে যেন অর্ধরাত্রি। কলকাতার বাড়িতে এখন কে কী করছে কিছুই জানি নে। পৃথিবীতে আমরা যাদের জানি সবাইকেই ফুটকি লাইনে জানি— অর্থাৎ মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁক ; সেই ফাঁকগুলো নিজের মনে যেমন তেমন ক'রে ভরিয়ে নিতে হয়। যাদের মনে করি সব চেয়ে ভালো জানি তাদেরও পরিচয়ের সঙ্গে বহুল পরিমাণে নিজের কল্পনা মিশিয়ে নিতে হয়। কত জায়গায় ঐক্যধারা ছিন্ন হয়, পথ-চিহ্ন লুপ্ত হয়, অনিশ্চিত অস্পষ্ট অন্ধকার থেকে যায়। সুপরিচিত লোকও যদি কল্পনার সূত্রে গাঁথা ছিন্ন অংশ মাত্র হয় তা হলে কার সঙ্গে, কিসের সঙ্গেই বা, আমার পরিচয় আছে! আমাকেই বা অবিচ্ছিন্ন রেখায় কে জানে। কিন্তু হয়তো বিচ্ছিন্ন ব'লেই, হয়তো তাদের মধ্যে কল্পনাযোজনার স্থান আছে ব'লেই তারা আমাদের যথার্থ অন্তরঙ্গ। নইলে অপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে বোধ হয় সকলেই অন্তর্যামী ছাড়া আর-সকলের কাছেই দুষ্প্রাপ্য। আমরা নিজেকেও অংশ-অংশ ক'রে জানি— কল্পনা দিয়ে পুরিয়ে নিয়ে একটা স্বরচিত গল্পের নায়ক ক'রে নিই মাত্র। খণ্ড উপকরণ নিয়ে আমরা নিজেকে নিজে সৃষ্টি ক'রে তুলব ব'লেই বিধাতা এই বিচ্ছেদগুলি রেখে দিয়েছেন।

১২৯

বোলপুর

৩১ অক্টোবর ১৮৯৪

প্রথম শীতের আরম্ভে সমস্ত দিন ধরে যে একটা উত্তুরে বাতাস দিতে থাকে সেইটে আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে। বাতাসটা হীহী করতে করতে আসছে; আমার আম্‌লকি-তরুশ্রেণীর পাতাগুলি হলদে হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপছে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। এখানকার বনরাজ্যের মধ্যে যেন খাজনা-আদায়ের পেয়াদা এসেছে— সমস্ত কাঁপছে, ঝরছে এবং দীর্ঘনিশ্বাসে আকুলিত হয়ে উঠছে। দুপুর বেলাকার রৌদ্রক্লান্ত বিশ্রামপূর্ণ বৈরাগ্যে, ঘন আম্রশাখায় ঘুঘুর অবিশ্রাম কূজনে, এই ছায়ালোকখচিত স্বপ্নাতুর প্রহরগুলাকে যেন বিরহবিধুর ক'রে তুলছে। আমার টেবিলের উপরকার ঘড়ির শব্দটাও এই মধ্যাহ্নের সুরের সঙ্গে যেন তাল রেখে চলেছে। ঘরের ভিতরে সমস্ত দুপুর বেলাটা কাঠবিড়ালির ছুটাছুটি চলছে। ফুলো লেজ, কালো এবং ধূসর রেখায় অঙ্কিত রোমশ নরম গা, ছোটো দুটি কালো ফোঁটার মতো দুটি চঞ্চল চোখ, নিতান্তই নিরীহ অথচ অত্যন্ত কেজো লোকের মতো ব্যস্ত ভাবটা দেখে আমার বেশ মজা লাগে। এই ঘরের কোণে লোহার জাল দেওয়া আলমারিতে ডাল চাল প্রভৃতি আহার্য সামগ্রী এই-সমস্ত লোভীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়— ঔৎসুক্যব্যগ্র নাসিকাটি নিয়ে তারা সারাদিন এই আলমারিটার চারি দিকে ছিদ্র খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দু-চারটা কণা যা আলমারির বাইরে বিক্ষিপ্ত থাকে সেইগুলিকে সন্ধান ক'রে নিয়ে সামনের গুটিকয়েক ছোটো তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়ে কুট্‌কুট্‌ ক'রে ভারী তৃপ্তির সঙ্গে তারা আহার করে; মাঝে মাঝে লেজের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে ব'সে সামনের দুটি হাত জোড় ক'রে

সেই শস্যকণাগুলিকে মুখের মধ্যে গুছিয়ে-গাছিয়ে জুত ক'রে নিতে থাকে—এমন সময় আমি একটুখানি নড়েছি কি অমনি চকিতের মধ্যে লেজটি পিঠের উপর তুলে দিয়ে দে-দৌড়। যেতে যেতে হঠাৎ একবার অর্ধপথে পাপোষটার উপর থেমে একটা পা তুলে ফস্ ক'রে একটা কান চুলকে নিয়ে আবার এসে উপস্থিত—এমনি সমস্ত বেলাই কুট্‌কাট্‌ ছুড়্‌ছুড়্‌ এবং তৈজসপত্রের মধ্যে টুংটাং ঝুন্‌ঝুন্‌ চলছেই।

কলিকাতা

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

ছেলেবেলা থেকে ঐ ফেরিওয়ালার হাঁকগুলো আমাকে কেমন একটু বিচলিত করে; নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় চিলের তীক্ষ্ণ ডাকটাও আমাকে যেন উদাস ক'রে দিত। অনেক দিন সেই ডাকটা আমার কানে আসে নি। আজকাল যে চিল ডাকে না তা নয়— আমারই এখন চিন্তা বেশি, কাজও ঢের; প্রকৃতির সঙ্গে আর আমার সে রকম ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। এখন সময় ফেলে রাখা চলে না; যদি বা মনের গতিকে কোনো বিশেষ কাজ করতে প্রবৃত্তি না হয় তবু একটা কাজের চেষ্টা করতে হয়, নিদেন অন্যমনস্কভাবেও একটা বই পড়বার ভান না করলে মন সুস্থ থাকে না। এটা কিন্তু কলকাতায়। মফস্বলে গেলে চুপ ক'রে চেয়ে থাকলেও হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কাজের অন্ধ দাসত্ব করতে হয় না। কর্তব্য কাজের বিরুদ্ধে কিছু বলতেই সাহস করি নে; কিন্তু যখন উপস্থিত কোনো কাজ নেই কিম্বা ভালো ক'রে সম্পন্ন করবার শক্তি নেই, তখনো কেবল অভ্যাসবশত বা সময়যাপনের তাগিদে যদি কাজ খুঁজে বেড়াতে হয়, তখনো যদি আপনাকে নিয়ে আপনি শান্তি না পাওয়া যায়, তা হলে অবস্থাটা খারাপ হয়েছে বলতে হবে। কাজ একটা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়মাত্র; মানুষ তো কাজের যন্ত্র নয়; পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে বিরামলাভ করবার শক্তিটা একেবারে হারানো তো কিছু নয়, কেননা তার মধ্যেও মনুষ্যত্বের একটা উচ্চ অধিকার আছে। দিন ও রাত্রি, কাজ ও বিরামের উপমা। দিনের বেলায় পৃথিবী ছাড়া আর আমাদের কিছুই নেই; রাত্রে পৃথিবীটাই কম, অনন্ত জ্যোতিষ্কজগৎটাই বেশি। তেমনি কাজের দিনে যুক্তিতর্কের আলোকে পৃথিবীটাকেই খুব স্পষ্ট ক'রে চোখের সামনে রাখা

চাই ; কিন্তু যখন বিশ্রামের সন্ধ্যা তখন পৃথিবীটাকে হ্রাস ক'রে দেওয়াই দরকার, তখন বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে বিরাট যোগ আছে সেইটেকেই বড়ো ক'রে দেখা চাই। সকাল বেলায় উঠে জানা চাই, আমরা পৃথিবীর মানুষ ; দিন অবসান হয়ে এলে অনুভব করা চাই, আমরা জগৎবাসী।

১৩১

শিলাইদহ
২৮ নবেম্বর ১৮৯৪

দিগন্তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বালির চর ধূ ধূ করছে— তাতে না আছে ঘাস, না আছে গাছ, না আছে বাড়িঘর, না আছে কিছু। আকাশের শূন্যতা, সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের চিরাভ্যস্ত; তার কাছে আমরা আর কিছু দাবি করি নে— কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সব চেয়ে বেশি শূন্য ব'লে মনে হয়। কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বৈচিত্র্য নেই; যেখানে ফলে শস্যে তৃণে পশুপক্ষীতে ভরে যেতে পারত সেখানে একটি কুশের অঙ্কুর পর্যন্ত নেই— কেবল একটা উদাস কঠিন নিরবচ্ছিন্ন বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা। ঠিক পাশ দিয়ে পদ্মা চলে যাচ্ছে; ও পারে ঘাট, বাঁধা নৌকো, স্নানরত লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান, অপরাহ্ণে নদীর ধারের হাটে কলধ্বনি; দূরে পাবনার পারে তরুশ্রেণীর ঘননীল রেখা— কোথাও গাঢ়নীল, কোথাও পাণ্ডুনীল, কোথাও সবুজ, কোথাও মাটির ধূসরতা— আর তারই মাঝখানে এই রক্তশূন্য মৃত্যুর মতো ফ্যাকাসে সাদা। সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তের সময় এই চরের উপর আর কিছুই নেই, কেউ নেই, কেবল আমি একলা।

১৩২

শিলাইদহ

৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪

শুক্লসন্ধ্যায় চরে যখন একলা বেড়াই, খানিকবাদে শ— প্রায় আসে। কালও সে এসেছিল। কাজকর্মের কথা কওয়ার পরে যেই একটু চুপ করেছি অমনি হঠাৎ দেখলুম, অনন্ত জগৎ সেই সন্ধ্যার আকাশে নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। কানের কাছে একটি মানুষের তুচ্ছ কথায় এই অসীম-আকাশ-ভরা একটি আবির্ভাব আবৃত হয়ে গিয়েছিল। যেই মানুষ চুপ করলে অমনি দেখতে দেখতে নিস্তব্ধ নক্ষত্রলোক হতে শান্তি নেমে এসে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ ক'রে তুললে ; যে সভার মধ্যে অনন্তকোটি জ্যোতিষ্ক নীরবে সমাগত আমিও সেই সভার এক প্রান্তে স্থান পেলুম। অস্তিত্ব-নামক এক মহাশ্চর্য ব্যাপারের মধ্যে ওরা এবং আমি এক আসন পেয়েছি।

১৩৩

শিলাইদহ

১১ ডিসেম্বর ১৮৯৪

সকাল সকাল বেড়াতে বোরোই। যতক্ষণ না শ— আসে ততক্ষণ মনটাকে শান্তশীতল ক'রে নিই। তার পরে হঠাৎ শ— এসে যখন জিজ্ঞাসা করে 'আজ দুধ খেয়ে কেমন ছিলেন' কিম্বা 'আজ কি মাসকাবারি হিসাব দেখা শেষ হয়ে গেছে', তখন বড়ো খাপছাড়া শুনতে হয়। আমরা নিত্য এবং অনিত্যের ঠিক এমন মাঝখানে প'ড়ে দুই দিকের ধাক্কা খেয়ে চলে যেতে থাকি। যখন আধ্যাত্মিক কথা হচ্ছে তখন গায়ের কাপড় এবং পেটের খিদের কথা আনলে ভারী অসংগত শুনতে হয়, অথচ আত্মা এবং পেটের খিদে চিরকাল একত্রেই যাপন ক'রে এল। যেখানটাতে জ্যোৎস্নালোক পড়ছে সেইখানেই আমার জমিদারি; অথচ জ্যোৎস্না বলছে 'তোমার জমিদারি মিথ্যা', জমিদারি বলছে 'তোমার জ্যোৎস্নাটা আগাগোড়াই ফাঁকি'। আমি ব্যক্তি এরই ঠিক মাঝখানে।

শিলাইদহ
১৪ ডিসেম্বর ১৮৯৪

এই চরগুলো এক সময়ে জলের নীচে ছিল কি না, সেইজন্যে এক-এক জায়গায় অনেক দূর পর্যন্ত বালির উপর জলের ঢেউ-খেলানো পদচিহ্ন পড়ে গেছে। সেই-সমস্ত থাকে-থাকে-ভাঁজ-কর' বালির উপর নানা রঙের চিকন আভা পড়ে ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড সাপের নানারঙা খোলসের মতো দেখাচ্ছিল। আমি মনে করলুম, পদ্মা তো একটা প্রকাণ্ড নাগিনীই বটে। সে এক সময় এই বৃহৎ চরের উপর বাস করত, এখন সেখানে কেবল তার একটা বৃহৎ খোলস সন্ধ্যার আলোয় প'ড়ে চিক্‌চিক্‌ করছে। বর্ষার সময় সে আপনার সহস্র ফণা তুলে ডাঙার উপর ছোবল মারতে মারতে, গর্জন করতে করতে, কেমন ক'রে আপনার প্রকাণ্ড বাঁকা লেজ আছড়াতে আছড়াতে, ফুলতে ফুলতে চলত, সেই দৃশ্যটাও মনে পড়ল। এখন সে শীতকালের সরীসৃপ, বিবরের মধ্যে অর্ধপ্রবিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় প্রতিদিন ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে।

বেড়াতে বেড়াতে ক্রমে এত বিচিত্র রঙ কখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল; কেবল জ্যোৎস্নার একরঙা শুভ্রতায় জলস্থল মণ্ডিত হয়ে গেল। এক সময় যে পূর্বদিকে দিনের উদয় হয়েছিল, জগতে কোথাও তার আর কোনো স্মৃতিচিহ্নই রইল না।

১৩৫

শিলাইদহ

৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

ইচ্ছা করছে, শীতটা ঘুচে গিয়ে প্রাণ খুলে বসন্তের বাতাস দেয় —আচকানের বোতামগুলো খুলে একবার খোলা জালিবোটের উপর পা ছড়িয়ে দিই এবং কর্তব্যের রাস্তা ছেড়ে দিনকতক সম্পূর্ণ অকেজো কাজে মন দিই। বছরের ছ মাস আমি এবং ছ মাস আর কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তা হলেই ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়। কারণ, সম্বৎসর খেপামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সম্বৎসর অপ্রমত্ততা বজায় রেখে চলা আমার মতো লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছ মাস অন্তর ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে, আর আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য বারো মাস সমভাবে ভদ্রতা রক্ষা ক'রে চলি কী ক'রে! মানুষের মহা মুশকিল এই, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজের আইন অনুসারে তাকে তিন শো পঁয়ষট্টি দিন এক ভাবেই চলতে হয়। আসলে নিজের মধ্যে যে একটা চিরনূতন চিররহস্য আছে সেটাকে সলজ্জে সভয়ে গোপন ক'রে নিজেকে সর্বসাধারণের কাছে নিতান্ত চিরাভ্যস্ত রুটিন-চালিত যন্ত্রটির মতো দেখাতে হবে। সেই জন্যে থেকে থেকে মানুষ বিগড়ে যায়, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ; সেই জন্যে অবাধে আপনাকে উপলব্ধি করতে শিল্প-সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়। সেই জন্যে সাহিত্য দস্তুরের-আঁচল-ধরা হলে নিজের উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে। সেই জন্যে বৈঠকখানাঘরে শিষ্টালাপে যেসব কথা চলে না সাহিত্যে সেগুলি গভীরতা ও উদারতা লাভ ক'রে অসংকোচে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। এই জন্যই ড্রইংরুমের চা-পান-সভার সুসভ্য সীমার মধ্যে সাহিত্যকে বদ্ধ করতে গেলে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতিকে ছিটের গাউন পরানোর মতো হয়।

শিলাইদহ

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

অদৃষ্টের পরিহাসবশত ফাল্গুনের এক মধ্যাহ্নে এই নির্জন অবসরে, এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরে, এই নিভৃত নৌকার মধ্যে ব'সে সমুখে সোনার রৌদ্র এবং সুনীল আকাশ নিয়ে, আমাকে একখানা বই-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। সে বইও কেউ পড়বে না, সে সমালোচনাও কেউ মনে রাখবে না ; মাঝের থেকে এমন দিনটা মাটি করতে হবে। জীবনে এমন দিন কটাই বা আসে। অধিকাংশ দিনই ভাঙাচোরা, জোড়াতাড়া ; আজকের দিনটি যেন নদীর উপরে সোনার পদ্মফুলের মতো ফুটে উঠেছে, আমার মনটিকে তার মর্মকোষের মধ্যে টেনে নিচ্ছে। আবার হয়েছে কী, একটা হলদে-কোমরবন্ধ-পরা স্নিগ্ধ বেগনি রঙের মস্ত ভ্রমর আমার বোটের চার দিকে গুঞ্জনসহকারে চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে। বসন্তকালে ভ্রমরগুঞ্জনে বিরহিণীর বিরহবেদনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, এ কথাটাকে আমি বরাবর পরিহাস ক'রে এসেছি ; কিন্তু ভ্রমরগুঞ্জনের মর্মটা আমি একদিন দুপুর বেলা বোলপুরে প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম। সেদিন নিষ্কর্মার মতো দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াচ্ছিলুম— মধ্যাহ্নটা মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল, গাছের নিবিড় পল্লবগুলির মধ্যে স্তব্ধতা যেন রাশীকৃত হয়ে উঠেছিল। সেই সময়টায় বারান্দার নিকটবর্তী একটা মুকুলিত নিম গাছের কাছে ভ্রমরের অলস গুঞ্জন সমস্ত উদাস মধ্যাহ্নের একটা সুর বেঁধে দিচ্ছিল। সেই দিন বেশ বোঝা গেল মধ্যাহ্নের সমস্ত পাঁচমিশালি শ্রান্তসুরের মূল সুরটা হচ্ছে ঐ ভ্রমরের গুঞ্জন— তাতে বিরহিণীর মনটা যে হঠাৎ হাহা ক'রে উঠবে তাতে আশ্চর্য কিছুই নেই। আসল কথাটা হচ্ছে, ঘরের মধ্যে যদি

খামখা একটা ভ্রমর এসে প'ড়েই ভোঁভোঁ করতে শুরু করে এবং ক্ষণে ক্ষণে শাসির কাঁচে মাথা ঠুকতে থাকে, তবে তাতে ক'রে তার নিজের ছাড়া আর কারো কোনো প্রকার ব্যথা লাগবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ঠিক জায়গাটিতে সে ঠিক সুরই দেয়। আজকের আমার এই সোনার-মেখলা-পরা ভ্রমরটিও ঠিক সুরটি লাগিয়েছে। নিশ্চয়ই বোধ হচ্ছে, কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করছে না— কিন্তু কেন যে আমার নৌকার চার পাশে ঘুর্‌ঘুর্‌ ক'রে মরছে আমি তো বুঝতে পারছি নে— নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রই তো বলবে, আমি শকুন্তলা বা সেজাতীয় কেউ নই।

শিলাইদহ

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

'সাধনা'র জন্যে লিখতে লিখতে অন্যমনস্ক হয়ে যাই; নৌকা চলে যায়, মুখ তুলে দেখি; খেয়া পারাপার করে, তাই দেখতে দেখতে সময় কাটে। ডাঙায় আমার বোটের খুব কাছে মন্থরগতি মোষগুলো তাদের বড়ো বড়ো মুখ তৃণগুল্মের মধ্যে পুরে দিয়ে, সেগুলো নেড়েচেড়ে নিয়ে, ফোঁস্ ফোঁস্ নিশ্বাস ফেলে, কচ্ কচ্ শব্দ করতে করতে খেতে খেতে লেজের ঝাপটায় পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে চলতে থাকে; তার পর একটা অতি দুর্বল উলঙ্গপ্রায় মনুষ্যশাবক এসে এই প্রশান্তপ্রকৃতি প্রকাণ্ড জন্তুটার পিঠে পাঁচনির গুঁতো মেরে হঠ্ হঠ্ শব্দ করতে থাকে, জন্তুটা তার বড়ো বড়ো চোখে এক-এক বার এই ক্ষীণ মানবকটির প্রতি কটাক্ষপাত করে পথের মধ্যে দুই-এক গ্রাস ঘাসপাতা ছিঁড়ে নিয়ে অব্যাকুলচিত্তে মৃদুমন্দ গমনে খানিকটা দূর সরে যায় আর ছেলেটা মনে করে তার রাখালি-কর্তব্য সমাধা হল। আমি রাখাল বালকদের মনস্তত্ত্বের এ রহস্যটা এ পর্যন্ত ভেদ ক'রে উঠতে পারলুম না। গরু কিম্বা মোষ যেখানে নিজে ইচ্ছাপূর্বক তৃপ্তভাবে আহার করছে, অকারণে উৎপাত ক'রে সেখান থেকে তাড়িয়ে আর খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ঠিক জানি নে। পোষ-মানা সবল প্রাণীদের উপর অনাবশ্যক উৎপীড়ন ক'রে প্রভুগর্ব অনুভব করা বোধ করি মানুষের স্বভাব। ঘন সরস তৃণগুল্মের মধ্যে মোষের এই চ'রে খাওয়া আমার দেখতে বড়ো ভালো লাগে। কী কথা বলতে কী কথা উঠল। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আজকাল অতি সামান্য কারণেই আমার সাধনার তপোভঙ্গ হচ্ছে। পূর্বপত্রে বলেছি, ক'দিন ধরে গোটাকয়েক ভ্রমর

আমার বোটের ভিতরে বাইরে অত্যন্ত চঞ্চলভাবে ব্যর্থ গুঞ্জনে ও বৃথা অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে— রোজই বেলা নটা-দশটার সময় তাদের দেখা যায়— তাড়াতাড়ি এক বার আমার টেবিলের কাছে ডেস্কের নীচে রঙিন শাসির উপরে আমার মাথার চারি ধারে ঘুরে আবার হুস ক'রে বেরিয়ে চলে যায়। আমি অনায়াসে মনে করতে পারি, লোকান্তর থেকে কোনো অতৃপ্ত প্রেতাত্মা রোজ সেই একই সময়ে ভ্রমর-আকারে একবার ক'রে আমাকে দেখে-শুনে প্রদক্ষিণ ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তা মনে করি নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওটা সত্যকার ভ্রমর, মধুপ, সংস্কৃতভাষায় যাকে কখনো কখনো বলে দ্বিরেফ।

শিলাইদহ

১৬ ফাল্গুন ১৮৯৫

নিজের সেই সুগভীর স্বপ্নাবিষ্ট বাল্যকালের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার কথা মনে পড়ছে— খুব বেশি দিনের কথা ব'লে তো মনে হচ্ছে না— অথচ এবারকার মানবজন্মের অর্ধেক দিন তো চলে গেছেই। আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত মাড়িয়ে মাড়িয়ে জীবনটা সম্পূর্ণ করি, কিন্তু মোটের উপরে সবটা খুবই ছোটো ; দুটি ঘণ্টা কালের নির্জন চিন্তার মধ্যে সমস্তটাকে ধারণ করা যেতে পারে। শেলি ত্রিশটা বছর প্রতিদিন সহস্র কাজে সহস্র প্রয়াসে জীবন ধারণ ক'রে দুটিমাত্র ভলুম জীবন-চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন ; তার মধ্যেও ডাউডেন সাহেবের বাজে বকুনি বিস্তর আছে। আমার জীবনের ত্রিশটা বছরে বোধ করি একখানা ভলুমও পোরে না। এই তো ব্যাপার, এইটুকু মাত্র কাণ্ড, কিন্তু এরই কত আয়োজন, কত দুশ্চেষ্টা। এইটুকুর রসদ জোগাবার জন্যে কত ব্যাবসা, কত জমিদারি, কত লোকজন। আছি তো এই দেড় হাত চৌকিতে চুপটি ক'রে ব'সে, কিন্তু কত রকমে পৃথিবীর কত জায়গাই জুড়ে আছি— সেই সমস্ত বাদসাদ পড়ে কেবল বাকি থাকে দুটি ঘণ্টার চিন্তা, তাও বেশি দিনের জন্যে নয়। আজকের আমার এই একলা বোটের দুপুর বেলাকার মনের ভাব, এই একটা দিনের কুঁড়েমি সেই কয়েকখানা পাতার মধ্যে কোথায় বিলুপ্ত হয়ে থাকবে। এই নিস্তরঙ্গ পদ্মাতীরের নিস্তব্ধ বালুচরের উপরকার নির্জন মধ্যাহ্নটি আমার অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কি কোথাও একটি ক্ষুদ্র সোনালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে !

১৩৭

শিলাইদহ

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

আজ আমি এক অনামিকা চিঠি পেয়েছি, তার আরম্ভেই আছে—

পরের পায়ে ধ'রে প্রাণদান করা
সকল দানের সার।

আমাকে লেখক কখনো দেখে নি; আমার 'সাধনা'র লেখা থেকে পরিচয়। লিখেছে, 'তোমার সাধনায় রবিকর পড়িয়াছে, তাই রবি-উপাসক যত ক্ষুদ্র যত দূরে থাকুক তবুও তার জন্যও আজি রবিকর বিকীর্ণ হইতেছে। তুমি জগতের কবি, তবুও সে ভাবিতেছে আজি তুমি তাহারও কবি।' ইত্যাদি। মানুষ প্রীতিদানের জন্য এত ব্যাকুল যে শেষকালে নিজের আইডিয়াকেই ভালোবাসতে থাকে। আইডিয়াকে রিয়ালিটির চেয়ে কম সত্য কেন মনে করি! ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা পাচ্ছি সেটা বস্তুত যে কী তারই ঠিকানা মিলছে না, আর আইডিয়া দিয়ে যেটা পাই সেই মনের সৃষ্টির প্রকৃত সত্তার প্রতিই বা কেন তার চেয়ে বেশি অনাস্থা করতে যাব? মানুষমাত্রের মধ্যেই একটি আইডিয়াল মানুষ আছে, তাকে কেবলমাত্র ভক্তি প্রীতি স্নেহের দ্বারা খানিকটা নাগাল পাওয়া যায়। প্রত্যেক ছেলের মধ্যে যে-একটি বৃহৎ আইডিয়াল আছে সে কেবল ছেলের মা সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করে, অন্য ছেলের মধ্যে সেই অনির্বচনীয়টিকে দেখতে পায় না। মা তার ছেলেকে যা মনে ক'রে প্রাণ দেয় সেইটেই কি মায়া, আর যা মনে ক'রে আমরা দিতে পারি নে সেইটেই সত্য? প্রত্যেক মানুষই অনন্ত যত্নের ধন, তার মধ্যে সৌন্দর্যের সীমা নেই··· কী কথা থেকে কী কথা উঠল। আসল কথাটা হচ্ছে,

এক হিসাবে আমি আমার ভক্তটির প্রীতি-উপহার গ্রহণের যোগ্য নই, অর্থাৎ যদি সে আমাকে আমার প্রত্যহের আবরণের মধ্যে দেখত তা হলে এরকম প্রীতি অনুভব করতেই পারত না— আর এক হিসাবে আমিও এই পরিমাণে, এমন-কি, এর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে প্রীতি পাবার অধিকারী।

শিলাইদহ

৬ মার্চ ১৮৯৫

সৌন্দর্যের চর্চা ও সুবিধার চর্চা এর মধ্যে কোন্‌টাকে প্রাধান্য দিতে হবে তর্কটা যদি এই হয়, তবে ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ার দৃষ্টান্তটা সে তর্কের মধ্যে ঠিক পড়ে না। কেননা ঘোড়ায় চ'ড়ে ছাতা মাথায় দিলে সেটা যে অসুন্দর হতেই হবে তা নয়, ও দিকে তাতে ঘোড়া চালাবার অসুবিধাও ঘটতে পারে। আসলে ওটা অসংগত। অসুবিধা অসৌন্দর্য এবং অসংগতি এই তিনটেকেই আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে— কিন্তু বোধ হয় শেষটাকেই সব চেয়ে বেশি। মেয়েদের মতো শাড়ি পরলে যদি কোনো পুরুষকে সুন্দর দেখতেও হয় তবু সে অদ্ভুত কাজে না যাওয়াই ভালো। সে সম্বন্ধে লজ্জাটা স্বাভাবিক লজ্জা। নিজেকে বেশি ক'রে লোকের চোখে ফেলতে একটা স্বভাবতই সংকোচ হওয়া উচিত, কেননা যথার্থ ভদ্রতার স্বভাবই হচ্ছে অপ্রগল্‌ভ। যেমন নিজের সম্বন্ধে সর্বদা অতিমাত্র সচেতন থাকাটা কিছু নয়, তেমনি পরের চেতনার উপর নিজেকে প্রবল বেগে আছড়ে ফেলতে বিশেষ একটা অপ্রবৃত্তি থাকাই উচিত। অবশ্য এর একটা সীমা আছে, কিন্তু সে সীমা অনেক দূরে; যখন কোনো প্রচলিত প্রথাকে আমি অন্যায় বা অনিষ্টকর মনে করি তখন সে বিষয়ে সাধারণকে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হলে চলবে না। কিন্তু সেই উচ্চ লক্ষ্যটা থাকা চাই। আমাদের দেশে যে মেয়েরা প্রথম জুতা পায়ে এবং ছাতা মাথায় দিয়েছেন, নিশ্চয়ই তাঁরা লোকের বিদ্রূপ-চোখেই পড়েছেন— তাই ব'লে এখানে লোকব্যবহারকে খাতির করা চলে না। কিন্তু মোটের উপর, সাধারণ মানুষের মতো চলার সুবিধা এই যে, তাতে

অন্য লোকেরও চলার সুবিধা হয় ছোটোখাটো সুবিধা-অসুবিধার জন্যও যদি সাধারণের অভ্যাস ও সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ ক'রে চলতে হয় তা হলে সেটা ঠিক মশা মারতে কামান পাতার মতোই অদ্ভুত হয়ে পড়ে— সেই অদ্ভুত অসংগতির মধ্যে যে হাস্যকরতা ও বিরক্তিজনকতা আছে তাকে অতিক্রম করবার উপযুক্ত কোনো উচ্চ অভিপ্রায় তার মধ্যে পাওয়া যায় না।

শিলাইদহ

৮ মার্চ ১৮৯৫

পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, চিঠিপত্রদ্বারা তার চেয়ে আরো একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরো একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি ও যে রকম ক'রে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না। আবার লেখায় যতখানি করে মুখের কথায় ততখানি করতে পারে না। এই কারণে, চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চব্বিশ ঘণ্টা কাছাকাছি আছে, যাদের মধ্যে চিঠি-লেখালেখির অবসর ঘটে নি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ ক'রেই জানে। যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নেই। এই চার পৃষ্ঠা চিঠি মনের ঠিক যে রস দোহন করতে পারে, কথা কিম্বা প্রবন্ধে কখনোই তা পারে না। আমার বোধ হয় ঐ লেফাফার মধ্যে একটি সুন্দর মোহ আছে— লেফাফাটি চিঠির প্রধান অঙ্গ, ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার।

কলিকাতা

৯ এপ্রিল ১৮৯৫

ঢং ঢং ক'রে দশটা বাজল। চৈত্র মাসের দশটা নিতান্ত কম বেলা নয়। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে, কাকগুলো কেন যে এত ডাকাডাকি করছে জানি নে, লকেট কমলালেবু এবং কাঁচামিঠে আম -ওয়ালা চুপড়ি মাথায় উচ্চ স্বরে সুর করে আমাদের দেউড়ির কাছ দিয়ে ডেকে যাচ্ছে।

ইচ্ছা করছে কোনো একটা বিদেশে যেতে— বেশ একটি ছবির মতো দেশ— পাহাড় আছে, ঝর্না আছে, পাথরের গায়ে খুব ঘন শৈবাল হয়েছে, দূরে পাহাড়ের ঢালুর উপরে গোরু চরছে, আকাশের নীল রঙটি খুব স্নিগ্ধ এবং সুগভীর, পাখি পতঙ্গ পল্লব এবং জলধারার একটা বিচিত্র মৃদু শব্দমিশ্র উঠে মস্তিষ্কের মধ্যে ধীরে ধীরে তরঙ্গাভিঘাত করছে। দূর হোক গে ছাই, আজ আর কিছুতে হাত না দিয়ে দক্ষিণের ঘরে একলাটি হাত পা ছড়িয়ে একটা কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তের বই নিয়ে পড়ব মনে করছি— বেশ অনেকগুলো ছবিওয়ালা নতুন-পাতা-কাটা বই। আলোচনা করবার মতো, মনের উন্নতি সাধন করবার মতো বই পৃথিবীতে অসংখ্য আছে, কিন্তু কুঁড়েমি করবার মতো বই ভারী কম; সেই রকম বই লিখতে অসামান্য ক্ষমতার দরকার। অবকাশের অবকাশত্ব কিছুমাত্র নষ্ট করবে না বরং তাকে রঙিন ও রসালো করে তুলবে, অথচ তাকে মন দিয়ে পড়বারও খোরাক দেবে, এই দুই দিক বাঁচিয়ে লেখা শক্ত। স্টীল পেনে লিখে মনের উপর দাগ কেটে দিয়ে যাবে না, পালকের কলমে লিখে লেখাটা মনের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, এমন পুষ্পকরথের সারথি পাওয়া যায় কোথায়!

১৪৩

কলিকাতা

২৪ এপ্রিল ১৮৯৫

এ দিকে দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসে গুর্‌গুর্‌ ক'রে মেঘ ডাকতে লাগল, এবং মাঝে মাঝে প্রবল বাতাসে দক্ষিণের বাগানের ছোটো বড়ো সমস্ত গাছগুলো হুস্‌হাস্‌ ক'রে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। মধ্যাহ্নটি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে চারি দিক ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। মনের ভিতরটা একটা অকারণ চঞ্চলতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল —তার হাতে যে কাজটাই দিই সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল।

মনের গতিক আকাশের গতিকের মতো— কিছুই বলা যায় না। মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন সে ছোটোখাটো উপস্থিত কাজ নিয়ে বেশ চালিয়ে দেয়, কোনো গোল করে না; হঠাৎ ত্রিশ দিনের দিন সে-সমস্ত কাজে সে পদাঘাত করতে থাকে; বলে, 'আমাকে এমন একটা কিছু কাজ দাও যা খুব মস্ত— যাতে আমার সমস্ত দিন রাত্রি, সমস্ত ভূতভবিষ্যৎ একেবারে গ্রাস ক'রে ফেলতে পারে।' তখন হাতের কাছে কোথায় বা কী পাওয়া যায়— কেবল ঘরে ঘরে বারান্দায় বারান্দায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকি। কতকগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড দস্তুর-বাঁধা কাজের মধ্যে মনটা যখন লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ায় তখনি তার সুস্থ অবস্থা বলি, আর যখন সে একটা প্রবল আবেগ— একটা বৃহৎ কর্মের মধ্যে একটা অহংবিস্মৃত ঐক্য লাভ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখন তাকে বলি পাগ্‌লামি। কিন্তু আমি তো মনে করি, মানুষের যথার্থ স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে সেই একটি প্রবল নিষ্ঠার মধ্যে সমস্ত জীবনটাকে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করবার ইচ্ছা। এই জন্যেই প্রতিদিন সমাজের মধ্যে থেকে, এক-এক দিন মনে হয়, 'আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!'

১৪৪

সাজাদপুর

২৮ জুন ১৮৯৫

বসে বসে 'সাধনা'র জন্যে একটা গল্প লিখছি— খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারি দিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের খেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্যই পায়, কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ বাতাস শিশির এবং শ্যামলতা সমস্তই বাদ পড়ে যায়। আমার গল্পের সঙ্গে যদি মেঘমুক্ত বর্ষা-কালের স্নিগ্ধরৌদ্ররঞ্জিত ছোটো নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি, এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তা হলে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে এক মুহূর্তে বুঝে নিতে পারত। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি।

১৪৫

সাজাদপুর

২ জুলাই ১৮৯৫

কাজ করতে করতে কোনো এক দিকে মুখ ফেরালেই দেখতে পাই, নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমাদের ঘরের লাগাও হাজির— যেন প্রকৃতিসুন্দরী কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো আমার জানলা-দরজার কাছে উঁকি মারছে ; আমার ঘরের এবং মনের, আমার কাজের এবং অবসরের চারি দিকে নবীন ও সুন্দর হয়ে আছে। এই বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এ পার এবং ও পার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা একটা স্বর্গীয় কবিতায় এপলোদেবের স্বর্ণবীণা-ধ্বনিতে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি ! আকাশ আমার সাকি, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় ক'রে ধরেছে— সোনার আলো মদের মতো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান ক'রে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকির মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত, যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি ও স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি ; সেইখানে আমি রাজা ; সেইখানে আমার সঙ্গে বরাবর ঐ সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগ থাকবে।

পাবনা-পথে

৯ জুলাই ১৮৯৫

এই আঁকাবাঁকা ইছামতী নদীর ভিতর দিয়ে চলেছি। এই ছোটো খামখেয়ালি বর্ষাকালের নদীটি— এই-যে দুই ধারে সবুজ ঢালু ঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের খেত, আখের খেত আর সারি-সারি গ্রাম— এ যেন একই কবিতার কয়েকটা লাইন,আমি বারবার আবৃত্তি ক'রে যাচ্ছি এবং বারবারই ভালো লাগছে। পদ্মার মতো বড়ো নদী এতই বড়ো যে সে যেন ঠিক মুখস্থ ক'রে নেওয়া যায় না, আর এই কেবল ক'টি বর্ষা-মাসের-দ্বারা-অক্ষর-গোনা ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ ক'রে আমার হয়ে যাচ্ছে।

পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘেঁষা নদী; তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী। স্নানের সময় মেয়েরা যে-সমস্ত গল্পগুজব নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীটির হাস্যময় কলধ্বনির সঙ্গে এক সুরে মিলে যায়। আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের পার্বতী যেমন কৈলাসশিখর ছেড়ে একবার তাঁর বাপের বাড়ি দেখে শুনে যান, ইছামতী তেমনি সম্বৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েক মাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে। তার পরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নূতন খবর শুনে নিয়ে, তাদের সঙ্গে মাখামাখি সখিত্ব ক'রে আবার চলে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশ মেঘে অন্ধকার; গুরুগুরু মেঘ ডাকছে এবং ঝোড়ো হাওয়ায় তীরের বনঝাউগুলো দুলে উঠছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঘন কালীর মতো অন্ধকার এবং জলের উপর

গোধূলির একটা বিবর্ণ ধূসর আলো প'ড়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মতো দেখতে হয়েছে। আমি ক্ষীণালোকে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখছি, উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে টেবিলের সমস্ত কাগজপত্র উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলবার উপক্রম করছে। ছোটো নদীটির উপরে ঘনবর্ষার সমারোহের মধ্যে একটি চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছে, মেঘলা গোধূলিতে নিরালা ঘরে মৃদুমন্দ স্বরে গল্প ক'রে যাবার মতো চিঠি। কিন্তু এটা একটা ইচ্ছামাত্র। মনের এই রকম সহজ ইচ্ছা-গুলিই বাস্তবিক দুঃসাধ্য। সেগুলি হয় আপনি পূর্ণ হয় নয় কিছুতে পূর্ণ হয় না; তাই অনেক সময় যুদ্ধ জমানো সহজ, গল্প জমানো সহজ নয়।

১৪৭

শিলাইদহ

১৪ অগস্ট ১৮৯৫

যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্ছি ততই কাজ জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে। কর্ম যে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশ-রূপেই জানতুম। এখন জীবনেই অনুভব করছি কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা; কাজের মধ্য দিয়েই জিনিস চিনি, মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখামুখি পরিচয় ঘটে। দেশদেশান্তরের লোক যেখানে বহু দূরে থেকেও মিলেছে সেইখানে আজ আমি নেমেছি; মানুষের পরস্পর শৃঙ্খলা-বদ্ধ এই একটা প্রয়োজনের চিরসম্বন্ধ, কর্মের এই সুদূরপ্রসারিত ঔদার্য আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। কাজের একটা মাহাত্ম্য এই যে, কাজের খাতিরে নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে অবজ্ঞা ক'রে যথোচিত সংক্ষিপ্ত ক'রে চলতে হয়। মনে আছে, সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা এক দিন সকালে দেরি ক'রে আসাতে আমি রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি ক'রে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে।' এই ব'লে ঝাড়নটি কাঁধে ক'রে আমার বিছানাপত্র ঝাড়-পোঁছ করতে গেল। কঠিন কর্মক্ষেত্রে মর্মান্তিক শোকেরও অবসর নেই। অবসরটা নিয়েই বা ফল কী। কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনু-শোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে সম্মুখের পথে প্রবাহিত ক'রে নিয়ে যেতে পারে, তবে ভালোই তো। যা হবার নয় সে তো চুকেছে, যা হতে পারে তা হাতের কাছে প্রস্তুত। যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্যে শোক ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নে, যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে ছোটো বড়ো সব কাজই তাকিয়ে আছে। কাজের

সংসারের দিকে চেয়ে দেখি, কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যাবসা করছে, কেউ চাষ করছে, কেউ মজুরি করছে; অথচ এই প্রকাণ্ড কর্মক্ষেত্রের ঠিক নীচে দিয়েই প্রত্যহ কত মৃত্যু, কত দুঃখ গোপনে অন্তঃশীলা বহে যাচ্ছে, তার আব্রু নষ্ট হতে পারছে না— যদি সে অসংযত হয়ে বেরিয়ে আসত তা হলে কর্মচক্র একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত শোকদুঃখটা নীচে দিয়ে ছোটে, আর উপরে অত্যন্ত কঠিন পাথরের ব্রিজ বাঁধা; সেই ব্রিজের উপর দিয়ে লক্ষলোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃশব্দে চলে যায়, নির্দিষ্ট স্টেশনটি ছাড়া আর কোথাও কারো খাতিরে মুহূর্তের জন্যে থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতায় মানুষের কঠোর সান্ত্বনা।

১৪৮

শিলাইদহ
৪ অক্টোবর ১৮৯৫

একটা ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আসন্ন হওয়াতেই আজকের এই নিভৃত নিস্তব্ধ উপভোগটি মনের মধ্যে এমন নিবিড়তর হয়ে এসেছে। যেন আমার কাছে আমার এই অভিমানিনী প্রবাসসঙ্গিনী করুণ অনিমেষ নেত্রে বিদায় নিতে এসেছে; আমাকে যেন বলছে, 'কিসের তোমার ঘরকর্না এবং আত্মীয়তার বন্ধন! আমি যে তোমার চির-দিনের সাধনা, তোমার সহস্রজন্মপূর্বের প্রিয়তমা, অনন্ত জীবনের অসংখ্য খণ্ড পরিচয়ের মধ্যে তোমার একমাত্র চিরপরিচিতা।' কিন্তু বর্তমানের কর্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সংসারে এ সব কথা অলীক শোনাবে। তা হোক, এই শরতের অপর্যাপ্ত শান্তির মধ্যে আমার আত্মাকে স্তরে স্তরে সিক্ত করে নেওয়া আমার পক্ষে কম ব্যাপার নয়। এ জীবনে আমার যা-কিছু গভীরতম তৃপ্তি ও প্রীতি সে কেবল এই রকম নির্জন সুন্দর মুহূর্তে পুঞ্জীভূতভাবে আমার কাছে ধরা দেয়। আমার জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই যেন একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে; কেবল তার আভাস পাই যে, আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবন-খনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু, আমার সমস্ত দুঃখকষ্টের তুষের ভিতরকার অমৃত শস্যকণা; সেটাকে যদি কখনো পরিস্ফুট ক'রে পাই তা হলে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতি প্রতিপত্তি সব চেয়ে বেশি হয়, যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তবু সেই দিকে চিত্তের অনিবার্য স্বাভাবিক প্রবাহ সেও একটা পরম লাভ।

১৪৯

কুষ্টিয়া
৫ অক্টোবর ১৮৯৫

কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে, বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম এবং প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুলছে। হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তির প্রাচুর্যে মানুষের কোনো ভালো হয় না; তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে কেবল অল্পই সুখ উৎপন্ন করে; এবং কেবল আয়োজনেই সময় কেটে গিয়ে উপভোগের অবসরমাত্র থাকে না। কিন্তু ব্রতযাপনের মতো জীবনযাপন করলে দেখা যায়, অল্প সুখই প্রচুর সুখ এবং সুখই একমাত্র সুখকর নয়। চিত্তের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মনন -শক্তিকে যদি সচেতন রাখতে হয়, যা-কিছু পাওয়া যায় তাকেই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবার শক্তিকে যদি উজ্জ্বল রাখতে হয়, তা হলে নিজেকে অতিপ্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করা চাই। Goetheর একটি কথা আমি মনে করে রেখেছি, সেটা শুনতে সাদাসিধা কিন্তু বড়োই গভীর—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.

Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের অতিভোগ নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিস-পত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়। বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভালো রকমে পাই।

আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের

সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয়, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি। যা মুখে বলছি, যা লোকের মুখে শুনে প্রত্যহ আবৃত্তি করছি, তা যে আমার পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা বুঝতেই পারি নে। এ দিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইঁট নিয়ে গড়ে তুলছে। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক ভাবে দেখি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে— প্রত্যেক পদটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত বাক্যটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না সেই রকম। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজন-ব্যাপারের অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সর্জ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি। বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে আমার ভিতরেও তেমনি অনাদি কাল ধরে একটা সৃজন চলছে; আমার সুখদুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করছে। এর থেকে কী যে হয়ে উঠছে তা আমরা স্পষ্ট জানি নে; কারণ, আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানি নে। কিন্তু নিজের প্রবহমাণ জীবনকে যখন নিজের বাহিরে নিখিলের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই; আমি আছি, আমি চলছি, আমি হয়ে উঠছি, এইটেকেই একটা বিরাট ব্যাপার ব'লে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সমস্তই আছে— আমাকে ছেড়ে কোথাও একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না; এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে, এই জ্যোতির্ময় শূন্যের সঙ্গে, আমার অন্তরাত্মার

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যোগ ; অনন্ত জগৎপ্রাণের সঙ্গে আমার এই-যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই প্রত্যক্ষ ভাষা এই-সমস্ত বর্ণ গন্ধ গীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমার মনকে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে, কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে। এই-যে আমার অন্তরের সঙ্গে বাহিরের কথাবার্তা আনাগোনা আদানপ্রদান— আমার যা-কিছু পাওয়া সম্ভব তা কেবলমাত্র এর থেকেই পেতে পারি, তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক ; শাস্ত্র থেকে যা পাই তা এইখানে একবার যাচাই করে না নিলে তা পাওয়াই হয় না। এই আমার অন্তর-বাহিরের মিলনে যা নিরন্তর ঘটে উঠছে আমার ক্ষুদ্রতা তার মধ্যে বিকার ও বাধার সঞ্চার ক'রে তাকে যেন আচ্ছন্ন না করে, আমার জীবন যেন এই পরিপূর্ণ মিলনের অনুকূল হয়, নিখিলকে আমার মধ্যে যেন আমি বাধা না দিই। কৃত্রিম জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি একে একে উন্মুক্ত হয়ে যাক, মুগ্ধ সংস্কারের এক-একটি বন্ধন কঠিন বেদনার দ্বারা একান্ত ছিন্ন হোক, নিবিড় নিভৃত অন্তরতম সান্ত্বনার মধ্যে অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তিলাভ করুক এবং জগতের সঙ্গে সরল সহজ সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যেন বলতে পারি 'আমি ধন্য'।

১৫০

কুষ্টিয়া

৬ অক্টোবর ১৮৯৫

আমার দিনগুলিকে রথীর কাগজের নৌকার মতো একটি একটি ক'রে ভাসিয়ে দিচ্ছি। কেবল মাঝে মাঝে একটি-আধটি গান তৈরি করছি এবং শরৎকালের প্রহরগুলির মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে পড়ে আছি। এই অপর্যাপ্ত জ্যোতির্ময় নীলাকাশ আমার হৃদয়ের মধ্যে অবনত হয়ে পড়েছে, আলোক রক্তের মধ্যে প্রবেশ করছে, সর্বব্যাপী স্তব্ধতা আমার বক্ষকে দুই হাতে বেষ্টন করে ধরেছে, একটি সকরুণ শান্তি আমার ললাটের উপর চুম্বন করছে। পূজার ছুটিতে সবাই কাজকর্ম ছেড়ে বাড়িতে এসেছে— আমারও এই বাড়ি— আমার বাড়ির লোকটি আমার সমস্ত খাতাপত্র কেড়েকুড়ে নিয়ে বলছে, 'তুমি কাজ ঢের করেছ, এখন একটুখানি থামো।' আমিও তাই নিরাপত্তিতে থেমে আছি। এর পরে কর্ম যখন আবার আমাকে এক বার হাতে পাবেন তখন টুঁটি চেপে ধরবেন; তখন আমার এই ঘরের লোকটি, আমার এই ছুটির কর্ত্রী কোথায় থাকবেন তাঁর আর উদ্দেশ পাওয়া যাবে না। প্রায় মাঝে মাঝে মনে করি 'সাধনা'র লেখার ঝুড়ি পদ্মার জলে ভাসিয়ে দেব; কিন্তু জানি, ভাসিয়ে দিলেও সে আমাকে তার পিছন পিছন টেনে নিয়ে চলবে।

১৫১

শিলাইদহ
১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫

সে দিন সন্ধ্যাবেলায় একখানা ইংরিজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা সৌন্দর্য আর্ট প্রভৃতি মাথামুণ্ড নানা কথার নানা তর্ক পড়া যাচ্ছিল। এক এক সময় এই-সমস্ত কথার বাজে আলোচনা পড়তে পড়তে শ্রান্তচিত্তে সমস্তই মরীচিকাবৎ শূন্য বোধ হয়; মনে হয়, এর বারো আনা কথা বানানো। সে দিন পড়তে পড়তে মনটার ভিতরে একটা নীরস শ্রান্তির উদ্রেক হয়ে একটা বিদ্রূপপরায়ণ সন্দেহ-শয়তানের আবির্ভাব হল। এ দিকে রাত্রিও অনেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ্ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শুতে যাবার উদ্দেশে এক ফুঁয়ে বাতি নিবিয়ে দিলুম। দেবা মাত্রই হঠাৎ চারি দিকের সমস্ত খোলা জানলা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে ভেঙে পড়ল। হঠাৎ যেন আমার চমক ভেঙে গেল। আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা শয়তানের মতো নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতিক্ষুদ্র বিদ্রূপ হাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম আনন্দচ্ছটাকে একেবারে আড়াল করে রেখেছিল। নীরস গ্রন্থের বাক্যরাশির মধ্যে কী খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম! সে কতক্ষণ থেকে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে নিঃশব্দে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি দৈবাৎ না দেখে অন্ধকারের মধ্যে শুতে যেতুম তা হলেও সে আমার সেই ক্ষুদ্র বাতির ব্যঙ্গের কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে নীরবেই নিলীন হয়ে যেত। যদি ইহজীবনে নিমেষের জন্যও তাকে না দেখতে পেতুম এবং শেষরাত্রের অন্ধকারে শেষবারের মতো শুতে যেতুম তা হলেও সেই বাতির আলোরই জিত থেকে যেত, অথচ সে বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে সেই রকম নীরবে সেইরকম মধুর মুখেই হাস্য করত— আপনাকে গোপন করত না, আপনাকে প্রকাশও করত না।

১৫২

নাগর নদীর ঘাট

১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫

কাল অনেক দিন পরে সূর্যাস্তের পর, ও পারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হাহা করছে— কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী— আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শতসহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ!

—